এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে

আবদুল্লাহ আল-মুতী

এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে

আবদুল্লাহ আল-মুতী

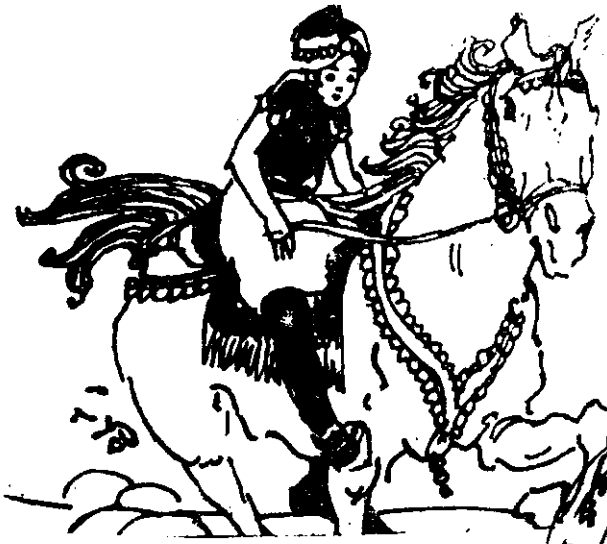

SEQAEP

নওরোজ কিতাবিস্তান

প্রকাশক
মনজুর খান চৌধুরী
নওরোজ কিতাবিস্তান
৫, বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০।
ফোন : ৭১৭৩৩৭৯

প্রকাশ কাল
প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৫৫
চতুর্থ মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৮৬
পঞ্চম মুদ্রণ : মার্চ ১৯৮৮
ষষ্ঠ মুদ্রণ : জুলাই ২০০২
সপ্তম মুদ্রণ : মে ২০১০
অষ্টম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩

স্বত্ব
সর্বস্বত্ব গ্রন্থকারের

প্রচ্ছদ
রফিকুন নবী

বর্ণবিন্যাস
ফোর ব্রাদার্স কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স
১০ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে
মৌমিতা প্রিন্টার্স
২৫ প্যারিদাস রোড
ঢাকা—১১০০।

মূল্য : ৭৫.০০ টাকা

ESHO BIGGANER RAJJE (Come to the land of Science) : *an anthology for children on everyday science* by Abdullah Al-Muti. Published by Manjur Khan Chowdhury. Nawroze Kitabistan. 5 Banglabazar, Dhaka 1100, Phone : 7173379. Cover Design & Illustration : Rafiqun Nabi. Date of Publication : May 1955. Eight Edition : February 2013. Price : Tk. 75.00 Only.

ISBN 984-400-000-9

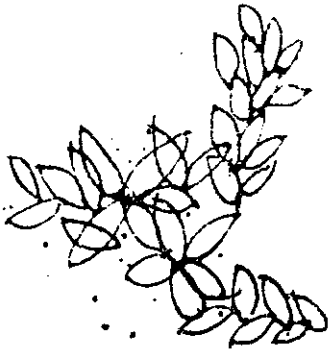

আগামী দিনের
বিজ্ঞানী আর কারিগর
বাংলাদেশের কিশোর-
কিশোরীদের হাতে

এই লেখকের অন্যান্য বই :

১. অবাক পৃথিবী
২. আবিষ্কারের নেশায়
৩. রহস্যের শেষ নেই
৪. জানা-অজানার দেশে
৫. সাগরের রহস্যপুরী
৬. আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
৭. মেঘ বৃষ্টি রোদ
৮. ফুলের জন্যে ভালবাসা
৯. সোনার এই দেশ
১০. তারার দেশের হাতছানি
১১. কীটপতঙ্গের বিচিত্র জগৎ
১২. টেলিভিশনের কথা
১৩. বিজ্ঞান ও মানুষ
১৪. স্বাধীনতা, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
১৫. এ যুগের বিজ্ঞান
১৬. বিপন্ন পরিবেশ
১৭. বিচিত্র বিজ্ঞান
১৮. প্রাণলোক : নতুন দিগন্ত
১৯. বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা
২০. বিজ্ঞানের বিস্ময়

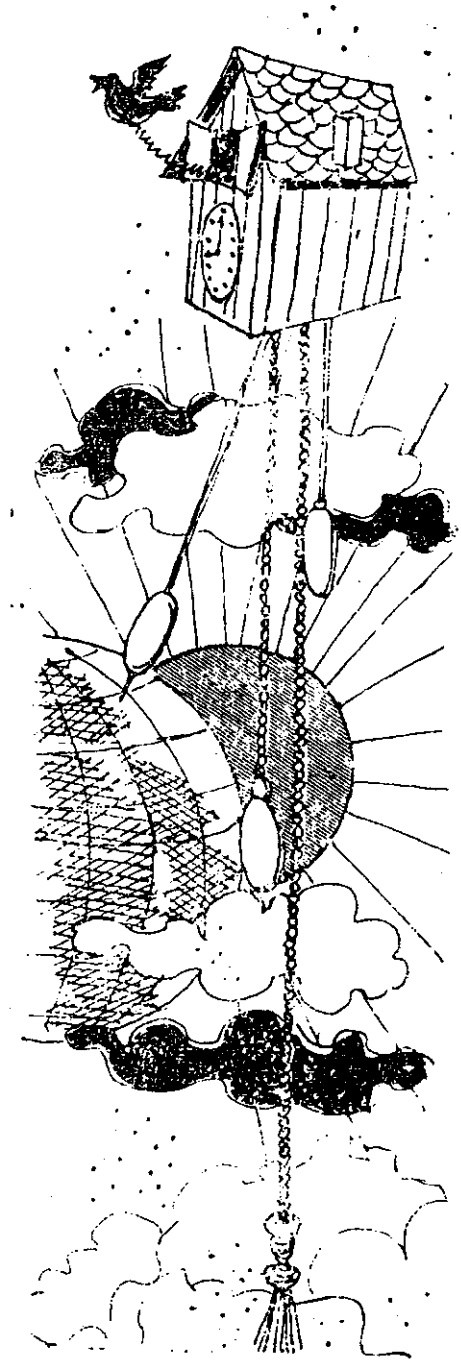

সূচিপত্র

রহস্যের ঝাঁপি ৯
নুনের মতন ভালবাসা ১২
চিনি শুধু মিষ্টি নয় ২০
আগুন! আগুন! ২৫
ফেলনা থেকে খেলনা ৩০
আটকে গেলো দম! ৩৬
ঘড়ি চলে টিক্ টিক্ ৪০
হাড় কাঁপানো শীতে ৫৭
ঠাণ্ডা লেগে কাবু ৬১
মেঘে মেঘে টক্কর ৬৬
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ৭১
টলমল পদভরে ৭৫
এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে ৮২

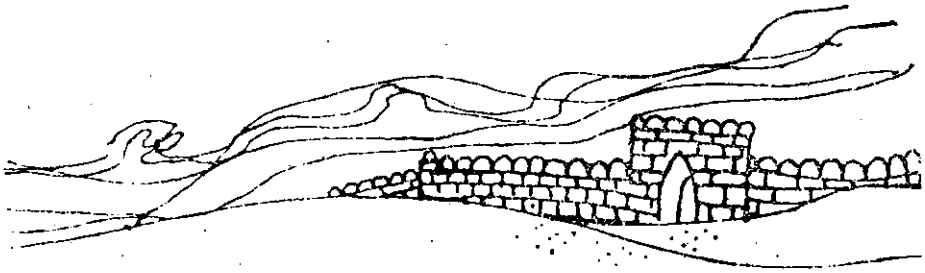

রহস্যের ঝাঁপি

টক্ টক্.... টক্ টক্....টক্ টক্....। অচিন দেশের রাজকুমার তার তাজী পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় তেপান্তরের মাঠে।

মাঠ-নদী-বন, ধূ-ধূ মরুভূমি ডিঙ্গিয়ে....মায়ার পাহাড়, হাড়ের জাঙ্গাল পেরিয়ে কত দিন কতো রাত পরে সে এসে পৌছয় সেই রহস্যের পুরীতে যেখানে মন্ত্রের ঘুমে ঘুমিয়ে আছে অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা।

কতকালের যে সে ঘুম তা কেউ যানে না। দুষ্টু ডাইনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে চারদিক সুম্‌সাম, নিঝ্‌ঝুম!....

রাজ্যের হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কাকাতুয়ার দাঁড়ে কাকাতুয়া.... কিন্তু সে সবই দাঁড়িয়ে আছে ঠায় নিথর নিঝুম হয়ে। মরণ-কাঠির ছোঁয়ায় সারা পুরী অচেতন।

কবে আসবে সেই রাজপুত্র, সোনার কাঠি ছোঁয়াবে রাজকন্যার শিয়রে!....তবে জাগবে সেই পুরীর প্রাণ....হাজার বছরের মন্ত্রের ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠবে রাজ্যের হাজার হাজার পাষাণ হয়ে যাওয়া মানুষ।....

এ সবই হল পুরনো দিনের রূপকথা। মায়ার কাঠি ছুঁইয়ে যেদিন রাজপুত্র পাষাণপুরীর ঘুম ভাঙ্গাত সে তো আজকের কথা নয়!

সেদিন রাজপুত্র রহস্যের খোঁজে বেরুত দেশ ছেড়ে দেশান্তরে। সাপের মাণিক, দুষ্টু রাক্ষস, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি আর অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যার দেখা মিলত বহু দূরের রাজ্যে, বহু পাহাড়-নদী-সাগর-মরুভূমি ডিঙ্গিয়ে।

সেদিনের রাজপুত্ররা তো আসলে থাকত সোনার খাঁচায় বন্দী হয়ে। সেই খাঁচার বাঁধন কেটে বেরিয়ে যেতে না পারলে তারা দেশের কথা, দুনিয়ার কথা, প্রকৃতির নানা রহস্য আর কতটুকুই বা জানতে পেতো!

আজ আর সেদিন নেই ঃ সেদিনের সে রাজপুত্রের জায়গা নিচ্ছে আজকের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই। আর রূপকথার সেই মায়ার পুরী হচ্ছে আসলে আমাদের চারপাশের এই দুনিয়াই।

তোমরা বলবে ঃ সে কি কথা? তা কি করে হবে?

হ্যাঁ, তাই। সাদা চোখে দেখলে আমাদের চারপাশের সব জিনিসই ঘুমিয়ে আছে মন্ত্রের ঘুমে, রহস্য আর মায়া ঘিরে আছে সব কিছুকে। কিন্তু আসলে সবারই রয়েছে অনেক গোপন কথা, সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ভাষা পাবার অপেক্ষায় রয়েছে সবাই।

এই রহস্য আর মায়ার বেড়াজাল ভাঙ্গবে তোমরাই। পাষাণ হয়ে যাওয়া প্রকৃতির বুকে নতুন মন্ত্রের জীয়নকাঠি ছোঁয়াবে তোমরাই।

বুঝি ভাবনায় পড়লে। সত্যি কি তাহলে আমরাই?....আমরা কি সত্যি পারব এই রহস্যের মায়াজাল ভাঙ্গতে, পাষাণের বুকে ভাষা ফোটাতে? কিন্তু সে সোনার জীয়নকাঠি কোথায় আমাদের?

সেই জীয়নকাঠির এ-যুগের নাম হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের ছোঁয়া পেলে প্রকৃতির রহস্যের ঝাঁপি আপনা আপনি খুলে যায়....নিঝুম নিথর ঘুমের দেশ যেন প্রাণ পায়।

বিজ্ঞানের জীয়নকাঠি বোবা দুনিয়াকে কথা বলায়। আমাদের চারপাশে যে চেনা-জানা দুনিয়া, এই জীয়নকাঠির ছোঁয়ায় তার সম্পূর্ণ আর এক নতুন রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

সে যেন এই দুনিয়ার মধ্যেই আর এক দুনিয়া....তার জন্যে ঘোড়া ছুটিয়ে বহু দূরে তেপান্তরের মাঠে যাবার কোন দরকার হয় না।

আমাদের ঘরের কোণের নুন, চিনি, আগুন, কয়লা....এগুলো আমরা রোজই দেখি কিন্তু কখনও হয়তো ভেবে দেখি নে এদের মধ্যে লুকিয়ে আছে কতো নতুন নতুন জানবার কথা। যুগ যুগ ধরে মানুষ এদের কতো রহস্যই যে ভেদ করেছে। আর ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারলে এগুলো মানুষের কতো কাজেই না লাগতে পারে।

ঘরিটা টিক্ টিক্ করে কথা বললে চলে অনবরত....দিন নেই রাত নেই কাজ করে চলে একটানা। হয়তো সে তার কাহিনী তোমাদের কাছে বলতে চায়, কিন্তু সেই জীয়নকাঠির অভাবে তার টিক্ টিক্ কথার ভাষা তোমরা বুঝতে পারো না। কিন্তু তার কথা বুঝলে দেখতে নিজের সম্বন্ধে কতো কথাই যে তার বলার রয়েছে!

আমাদের চারপাশের প্রকৃতিতে আসে নানা পরিবর্তন। শীতের হিমেল হাওয়া যেন একটা দুষ্টু দানবের নিঃশ্বাস....এই নিঃশ্বাসের ছোঁয়া গাছের সবুজ পাতাগুলোকে ঝরিয়ে দেয়। কুঁকড়ে যাওয়া রাতের কান্না বুঝি শিশির হয়ে ঝরে পড়তে থাকে....আবার শীতের পরে বসন্ত আসে গাছে গাছে কচি পাতা আর নতুন প্রাণের আশ্বাস নিয়ে।

বর্ষার আকাশে গুড়-গুড় মেঘের ডাক হয়তো আসলে বিজলি দৈত্যের দাঁত কড়মড়ানি ঝড় আর বজ্র হয়তো আসলে 'দেবতা' আর 'দৈত্য'দের লড়াই!

বৃষ্টিতে বন্যায় কখনও কখনও সারাটা দেশ সয়লাব হয়ে যায়। যতদূর চোখ যায় থৈ থৈ পানিতে ভাসতে থাকে চারদিক....কখনও বা ভূমিকম্পের একটা দৈত্য দুপদাপ হুড়মুড় করে দুনিয়াকে কাঁপিয়ে সব কিছু ভেঙ্গেচুড়ে তজনজ করে দিয়ে যায়।

এগুলো মানুষের কম ক্ষতি করে না। এসবের মধ্যেই বা লুকিয়ে আছে কোন্ রহস্য?

আর এই দৈত্যের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোই বা যায় কি করে? কি করে অন্ধ প্রকৃতিকে মানুষের বশে আনা যায়?

তারও জবাব হল এ যুগের জীয়নকাঠি সেই বিজ্ঞানই।

বিজ্ঞানের আলোতে যখন প্রকৃতির রহস্য ভেদ করা যাবে, তখনই কেবল এই সব দৈত্যের প্রাণ-ভোমরাকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে ফেলা সম্ভব হবে। আর এই সব দৈত্যের প্রাণ-ভোমরাকে পিষে মারলেই মায়ার জাল ছিন্নভিন্ন হবে, নতুন জীবনের আনন্দে হেসে উঠবে সমস্ত প্রকৃতি।

তাই এসো আমরা বিজ্ঞানের জীয়নকাঠি নিয়ে প্রকৃতির রহস্যের ঝাঁপি খুলি।

এসো সবাই মিলে এক জোট হয়ে আমাদের চারপাশের চেনা-জানা প্রকৃতির রহস্যের জালকে ভেদ করি।

নুনের মতন ভালবাসা

রূপকথাটা আদতে ছিল পাঞ্জাব দেশের; এখন ক্রমে ক্রমে আমাদের দেশেও চালু হয়ে গিয়েছে।

বাদশাহর একদিন কি খেয়াল চাপল, তাঁর শাহজাদীদের ডেকে শুধালেন ঃ আচ্ছা, বল দেখি, তোমরা আমাকে কে কেমন ভালবাসো?

বড় রাজকন্যে জবাব দিলেন ঃ ঠিক চিনির মতো।

মেঝো রাজকন্যে বললেন ঃ মধুর মতো।

সেজো রাজকন্যের জবাব ঃ খুব মিষ্টি আর খোশ্‌বুদার শরবতের মতো।

আর সবচেয়ে ছোট যে টুকটুকে কন্যাটি তিনি কি জবাব দিলেন, জানো? তিনি বললেন ঃ বাবা, আমি তোমাকে ভালবাসি নুনের মতো ।

শুনে তো বাদশাহ একেবারে থ' খেয়ে গেলেন। বলে কি! শুধু নুনের মতো?....

হ্যাঁ, নুনের মতো। রাজকন্যা তেমন বেয়াড়া কিছু বলেন নি। সত্যি সত্যি পানি আর হাওয়াকে বাদ দিলে আমাদের শরীরের জন্যে নুনের চেয়ে দরকারি জিনিস আর কি আছে? নুন এত দরকারি বলেই না কথায় বলে ঃ "নুন খাই যার। গুণ গাই তার।"

আগের দিনে মিসর দেশে অবাধ্য গোলামদের সাজা দেওয়া হতো নির্জন কুঠরির মধ্যে ফেলে রেখে তাদের নুন খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে। শুনতে খুব সোজা মনে হলেও এ কিন্তু ভারি জবর সাজা। আলুনী খাবার খেয়ে খেয়ে ক'দিনের মধ্যেই লোকগুলো একেবারে নির্জীব মরার মতো হয়ে পড়তো। এই ভয়েই তাদের আর মালিকদের কোন রকম অন্যায় হুকুমও অমান্য করবার সাহস হতো না।

সেই রূপকথার রাজাও একদিন অবস্থাগতিকে পড়ে থরে থরে সাজানো বহু রকমের ভাল ভাল খাবার সামনে রেখেও নুন দেওয়া হয়নি বলে কোনটাই মুখে তুলতে পারলেন না; তখন ছোট মেয়ের কাছে শিক্ষা পেয়ে তিনি বুঝলেন আমাদের রোজকার জীবনে নুন সত্যি সত্যি কতখানি দরকারি জিনিস ।

মানুষের ইতিহাস যেমন পুরনো, নুনের ইতিহাসও কিন্তু তেমনি পুরনো। হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মেরও ২,৭০০ বছর আগে চীনদেশের একখানা বইতে প্রথম নুনের ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। সেই কোন্ পুরনো যুগ থেকে মিসর দেশে উটের পিঠে করে নুনের ব্যবসা চলতো, ইতিহাস থেকে তার কথাও আমরা জানতে পাই।

যতদূর জানা যায়, এশিয়া-মাইনর, আরব এসব দেশে আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে নুনের ব্যবসা চালু ছিল। আরবরা নুনকে একটা সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করতো। তাই বাণিজ্যের

পসরা নিয়ে ধূ-ধূ মরুভূমির বুকে অনেক দূরের পথে কোন কাফেলা পাড়ি দেবার আগে যাতে ব্যবসায় খুব লাভ হয়, আর যাত্রীরা নিরাপদে ফিরে আসতে পারে, সে জন্যে তারা খানিকটা নুন পুড়িয়ে নিতো।

সে-সময়ে এসব নুন সবই তৈরি হত সমুদ্রের লোনা পানি রোদে রেখে বা জ্বাল দিয়ে শুকিয়ে ফেলে। সমুদ্রের পানি হল পৃথিবীতে নুনের এক বিশাল ভাণ্ডার। সমুদ্রের নুন দেখতে একটুখানি কালচে রকমের আর মোটা দানার। আমাদের দেশে বাজারে যে নুন বিক্রী হয় তার বেশির ভাগই সমুদ্রের পানি থেকে তৈরি। চট্টগ্রামে সমুদ্রের কাছাকাছি এলাকায় লোনা পানি শুকিয়ে প্রচুর নুন তৈরি হয়। মাটির নিচে যে আবার বিরাট বিরাট জমাট নুনের কাঁড়ি পাওয়া যায় এটা আবিষ্কার হয়েছে আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে পোলাণ্ড দেশে। পোলাণ্ডের এই নুনের খনি এত

বিরাট যে, হাজার বছর ধরে এখান থেকে অনবরত নুন তোলা হচ্ছে, কিন্তু আজও তার শেষ হবার কোন লক্ষণ নেই।

আজকাল যেমন ইচ্ছে হলেই বাজার থেকে যত খুশি নুন কিনতে পাওয়া যায়, আগেকার দিনে কিন্তু মোটেই এমনি ছিল না। তখন নুন ছিল একটা বেজায় রকমের দামী জিনিস, আর তার মর্যাদাও ছিল তেমনি। ১৪২৯ সালে ফরাসি দেশে একটা আইন করে বলে দেওয়া হয় যে সাধারণ লোকেরা আর নিজেদের খুশিমতো নুন তৈরি করতে পারবে না। দেশের খরচ চালাবার জন্যে নুনের ওপর এমনভাবে ট্যাক্স বসাবার ব্যবস্থা করা হয় যাতে গরিব লোকেরা নুন কিনতে না পারে, কেবল যাদের অনেক টাকা-কড়ি আছে তারাই কিনতে পারে।

কিন্তু এ-রকম বিদঘুটে আইনের ফল মোটেই ভাল হয় নি। নুনের মতো এমন একটা দরকারি জিনিস নিয়ে এমন ছেলেখেলা লোকে মানতে চাইবে কেন? এমনি নানা অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে ক্রমে ক্রমে দেশের লোক এমন ক্ষেপে ওঠে যে, আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগে ১৭৮৯ সালে ফরাসি দেশে এক বিপ্লব হয়।

১৮৫৬ সালে ভারতবর্ষেও বিদেশী শাসকরা নুনের ওপরে চড়া ট্যাক্স বসিয়ে দেয়, সমুদ্রের ধারের লোকদের নুন তৈরি করা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফরাসি দেশের মতো এ-দেশেও লোকের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। সে সময়কার সিপাহী বিদ্রোহ, তারপর গান্ধীজীর লবণ আইন অমান্য আন্দোলন এসবের কথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ।

তবে দেখ, জিনিসটা দেখতে সামান্য মনে হলেও আসলে এটা মোটেই হেলাফেলার জিনিস নয়—এই সামান্য নুন নিয়ে সারা দেশজোড়া কতো কি এলাহী ব্যাপার ঘটে যেতে পারে!

কিন্তু তোমরা হয়তো শুনলে তাজ্জব হবে এমন দরকারি যে নুন তা আমাদের পেটে নাকি হজম হয় না। কথাটা একেবারে মিছে নয়। একজন লোকের ওজন যদি হয় পঞ্চাশ কেজি তাহলে তার শরীরে মোটামুটি আধ কেজি নুন রয়েছে। জানো তো আমাদের শরীর হচ্ছে খুব ছোট ছোট অসংখ্য কোষ দিয়ে তৈরি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের শরীরের বেশির ভাগ কোষের মধ্যেই নাকি নুনের তেমন হদিস খুঁজে পাওয়া যায় না,—বেশির ভাগ গাছের কোষেও না। নুন থাকে শুধু আমাদের রক্তের মধ্যে।

তোমরা হয়তো অমনি ফস করে জিজ্ঞেস করে বসবে ঃ আর কোথাও না, কেবল রক্তের মধ্যে? তাহলে আমরা যে নুন খাই তা যায় কোথায়? আর তা দিয়ে শরীরের হয়ই বা কি?

সে এক মজার ব্যাপার । বলছি, শোন।

সমুদ্রের মধ্যেকার নিচুস্তরের যে-সব প্রাণী—যেমন, জেলি-ফিশ, অ্যানিমোনি, ঝিনুক, চিংড়ি—এদের গায়ে কোন রক্তই নেই। অর্থাৎ, রক্ত বলতে যা আছে তা আসলে সমুদ্রের পানিরই শামিল । এদের সারা গা দিয়ে সমুদ্রের পানি শরীরের ভেতর ঢুকে যায়। এই পানিই এদের সমস্ত হজম করা খাবার-দাবার শরীরের কোষে নিয়ে পৌঁছে দেয়।

সমুদ্রের উঁচুদরের মাছ আর ডাঙ্গার প্রাণীদের গায়ে যে রক্ত তা রীতিমতো নোনতা—এক ভাগ সমুদ্রের লোনা পানি আর তিন ভাগ সাধারণ মিঠে পানি মেশালে যেমন হবে অনেকটা তেমনি। ডাঙ্গার প্রাণীদের মধ্যে মানুষও পড়ে, কাজেই মানুষের রক্তও এমনি।

কিন্তু আমাদের রক্তের মধ্যে নুনের দরকারটা কি তাহলে? সে-কথা বুঝতে হলে একটু পৃথিবীর পুরনো ইতিহাসের কথা জানতে হবে।

আমরা সবাই আজকাল ডাঙ্গায় বসবাস করলে কি হবে, বিজ্ঞানীরা বলছেন, আজ থেকে বহু কোটি বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা ওই জেলিফিশের মতোই সমুদ্রের তলায় থাকতো। সমুদ্রের তলায় থাকার তুলনায় প্রাণীদের ডাঙ্গার ওপর ওঠে থাকার সময়টা নেহাতই কম। বহু কোটি বছর ধরে সমুদ্রের তলায় থাকতে থাকতে জীবকোষগুলোর যে নোনা পানিতে ডুবে থাকার স্বভাব হয়ে গিয়েছে ডাঙ্গায় ওঠেও তা আর ছাড়ানো যায় নি। হয়তো তাই সমুদ্রের নিচুস্তরের জীবদের মতো আমাদের শরীরের কোষগুলোও অনেকটা নোনা পানিতেই ডুবে থাকতে চায়; আর সেই জন্যেই আমাদের রক্তের মধ্যে নুন না থাকলে এক দণ্ড চলে না।

কলেরা হয়ে কারো শরীর থেকে যদি খুব বেশি পানি আর নুন বেরিয়ে যায় তাহলে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ডাক্তাররা নুন-গোলা পানির স্যালাইন ইঞ্জেকশন দেন। আজকাল ডায়রিয়ার চিকিৎসার জন্যে ওরাল স্যালাইন বা লবণ-গুড়ের শরবত বেশ কাজ দিচ্ছে।

এই একই কারণে মানুষের মতো কুকুর, বেড়াল বা পাখিদেরও নুনের দরকার হয়। তবে এরা নুন ছাড়াও বেশ কিছুদিন কাজ চালিয়ে যেতে পারে; কিন্তু মানুষ, ঘোড়া বা গরু তা পারে না। তার কারণ মানুষ, ঘোড়া বা গরুর বেলায় আরো একটা ব্যাপার আছে। গরমের দিনে ঘেমে ঘেমে আমাদের শরীর ঠাণ্ডা রাখতে হয়। সারা শরীরের লোমকূপের গোড়া দিয়ে রোজ প্রচুর ঘাম বেরিয়ে আসে; এই ঘামের পানিটুকু বাষ্প হয়ে উবে গিয়ে শরীরকে ঠাণ্ডা করে। কিন্তু ঘামের সাথে শরীর থেকে প্রচুর নুনও বেরিয়ে যায়। অনবরত গা থেকে এমনি করে নুন বেরিয়ে যায় বলেই আমাদের রোজকার খাবারের সঙ্গে নিয়মিত নুন না খেলে চলে না।

সব জানোয়ার কিন্তু ঘামে না। যেমন, কুকুর বা বেড়ালের কেবল পায়ের তলায় আর মুখের খানিকটা জায়গা ছাড়া সারা গায়ে আর কোথাও ঘামের গ্রন্থি নেই। খুব বেশি গরমে ঠাণ্ডা হবার দরকার হলে কুকুর তাই জিব বার করে হাঁপায়। জিব থেকে যে বাষ্প বেরোয় তাতেই তার ঘামবার কাজ হয়, তাকে খানিকটা আরাম দেয়।

গরু বা ঘোড়ার শরীরে অনেক সময় নুনের টান পড়ে যায়। তাই গরমের দিনে তারা একে অন্যের গা চেটে চেটে নুন খায়। এদের শরীর ভাল রাখার জন্যে খাবারের সঙ্গে অল্প পরিমাণে নুন দিতে হয়।

ঘোড়ারা গরমের দিনে একে অন্যের গা চেটে চেটে নুন খায়।

মানুষের মধ্যে যারা আবার খুব বেশি খাটুনির কাজ করে—যেমন খনির কাজ, জাহাজের বয়লারে কয়লা ঠেলার কাজ, কল-কারখানা বা মাঠের কাজ—তাদের সারা দিন অনবরত ঘামতে হয়। তাই তাদের শরীরে ঘাটতি মেটাবার জন্যে নুনের দরকার হয় খুব বেশি।

বিলেতে বা অন্যান্য ঠাণ্ডা দেশে লোক ঘামে কম, তাই সেখানে নুন খুব কম খেলেও চলে। কিন্তু আমাদের মতো গরম দেশের ব্যাপার ঠিক তার উলটো। তাই নুনের অভাব হলেও সারা দেশ জুড়ে হাহাকার পড়ে যায়—নুনের দাম দশ-বিশ টাকা কেজি বা তার বেশিও ওঠে।

বছরে সারা দুনিয়ায় চার-পাঁচ কোটি টন নুন খরচ হয়, অর্থাৎ মাথাপিছু প্রায় আট-ন' কেজি করে পড়ে। এর সবটা যে খাওয়ার জন্যে খরচ হয় তা কিন্তু নয়।

খাওয়া ছাড়াও নুন যে আমাদের রোজকার জীবনে আরো কত শত কাজে লাগে তা আর বলে শেষ করা যায় না। জুতোর চামড়া পাকা করতে; কাচ, সাবান, কাগজ, বরফ, রুটি, কৃত্রিম রবার, প্লাস্টিকের জিনিস তৈরি করতে; মাছ-মাংস, ফলমূল জমিয়ে রাখতে; এ ছাড়া নানা রকম রাসায়নিক জিনিস আর ওষুধ-পত্র তৈরি করতে আজকাল নুন ছাড়া চলে না।

বরফের সাথে নুন মেশালে বরফের তাপমাত্রা আরো কমে যায়। তাই পানি থেকে বরফ তৈরি করার জন্যে বরফের কারখানায় নুন ব্যবহার করা হয়। একই ভাবে আইস-ক্রীম জমাবার জন্যেও নুন মেশানো অতি ঠাণ্ডা বরফ কাজে লাগে।

আমাদের দেশে অনেকে নুন আর তেল মিশিয়ে দাঁত মাজে। ডাক্তাররা বলেন এটা দাঁতের পক্ষে ভাল, কেন না নুন জীবাণু নষ্ট করে। আর সেই জন্যেই মাছ-মাংস বা বাঁটা মসলায় নুন মিশিয়ে রাখলে তা সহজে নষ্ট হয় না। নুন জীবাণু নষ্ট করে। বলে গরম পানিতে সামান্য নুন মিশিয়ে গড়গড়া করলে গলার ব্যথা তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যায়।

নুনের খনি থেকে দু'রকমভাবে নুন তোলা যায়। এক হচ্ছে কয়লা খনির মতো খনির ভেতরে নেমে কেটে কেটে নুন তোলা। তফাত কেবল এই যে, কয়লা খনির ভেতরটা হল কুচ কুচে কালো, আর নুনের খনির ভেতরটা ধবধবে সাদা। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে ঃ খনির ভেতরে লম্বা নল দিয়ে পানি ঢুকিয়ে দিলে নুন গলে যায়; তখন সেই পানিকে আবার পাম্প করে ওপরে তুলে রোদে শুকিয়ে নিলেই নুন পাওয়া গেল। এতে খনির ভেতরে আর মানুষ নামবার দরকার হয় না।

খাবার নুনের একটা বৈজ্ঞানিক নাম আছে—সেটা হল সোডিয়াম ক্লোরাইড। অর্থাৎ সোডিয়াম ধাতুর একটা পরমাণু আর ক্লোরিন গ্যাসের একটা পরমাণু (এ দুটোর একটাও কিন্তু মানুষের খাবার নয়) হাত ধরাধরি করে হয় একটা নুনের অণু। সোডিয়ামের ল্যাটিন নাম ন্যাট্রিয়াম; সাংকেতিক চিহ্ন Na। আর ক্লোরিনের সাংকেতিক চিহ্ন Cl। তাই বিজ্ঞানীরা সোডিয়াম ক্লোরাইডকে সংক্ষেপ করে লেখেন NaCl। কথাটা শিখে রাখো, সময়মতো বন্ধুবান্ধব ভাই-বোনকে শুনিয়ে অবাক করে দিতে পারবে।

চিনি শুধু মিষ্টি নয়

সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠে শীতের কাঁচা রোদ্দুরে বসে চাই এক পেয়ালা গরম গরম চা। তার সঙ্গে যদি পিঠে কিংবা এই জাতীয় কিছু টা-ও থাকে তাহলে তো ব্যস! ছেলে-বুড়োর আর কোন কথা নেই! সত্যি বলতে কি, আমরা যেন দিন দিন বেশ চা-প্রিয় হয়ে উঠছি। চা খাওয়া যার অভ্যেস সকালে ঠিকমতো চা না পেলে তার মেজাজটাই কেমন যেন খিঁচড়ে যায়।

আর চায়ের আসরে চিনি না হলে যে চলে না এতো জানা কথাই কিন্তু শুধু কি চায়ের আসরে? চিনি দিয়ে যেসব জিনিস তৈরি হয় তার দু-চারটের নাম করলেই হয়তো আর জিভের পানি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। যেমন ধর—সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, আইস-ক্রীম, লজেঞ্চুস, চকোলেট, কেক, জেলি -মোরব্বা—আর কতো নাম করব।

কিন্তু চিনি এমন সুখাদ্য হলেও তার দাম অনেক; আবার সব জায়গায় সব সময় পাওয়াও যায় না। তখন চিনির কাজ গুড় দিয়ে চালাতে হয়। লোভনীয়তার

দিক দিয়ে পাটালি গুড় চিনির চেয়ে কিছু কম যায় না; কোন কোন জায়গার পাটালি গুড় তো স্বাদে-গন্ধে চিনিকে টেক্কা দিতে পারে।

আসলে চিনির গোড়াপত্তন তো গুড় থেকেই! যেসব গাছ বা ফলের রস মিষ্টি—যেমন আখ, খেজুর, আঙ্গুর—তার রস জ্বাল দিয়ে সঙ্গে চুনের পানি এবং আরো কয়েকটা জিনিস মিশিয়ে ময়লাটা কাটিয়ে ফেললেই তৈরি হয় পরিষ্কার চিনি। চিনির কলে অনেক সময় হাড়ের কয়লার ভেতর দিয়ে রসকে চালিয়ে দিয়েও চিনি পরিষ্কার করা হয়।

এই উপমহাদেশে আখের গুড়ের চল হয়েছিল আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে সেই আর্যদের সময়ে। গোড়াতে আখের চাষ হত কেবল বাংলাদেশে, তারপর ক্রমে তা সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আজ থেকে তেইশ শো বছর আগে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের এক বর্ণনায় দেখা যায় সেকালে সিন্ধু নদ অঞ্চলে এক রকম 'মধুঝরা নলখাগ্‌ড়া' জন্মাত। বলা বাহুল্য এখানে আখের কথাই বলা হয়েছে।

সাদা চিনির আবিষ্কার হয় প্রথমে চিন দেশে; সেখান থেকেই এর নাম হয়েছে 'চি-নি'। চীন দেশ থেকে চিনি আমাদের দেশে আসে, তারপর ক্রমে ক্রমে আরব আর মিসরে। মিসর দেশে চিনির আর একটু রকমফের হয়, চিনি থেকে তৈরি হয় মিসরি; এই মিসরি কথাটাও এসেছে মিসর দেশের নাম থেকে। আরব আর মিসর দেশের কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে ভূমধ্যসাগরের ধারে ধারে ইউরোপের দেশগুলোতেও আখের চাষ ছড়িয়ে পড়ে।

আজ থেকে উনিশ শো বছর আগে রোম সম্রাট নিরোর সময়কার একজন বৈদ্য লিখেছেন, "ভারতের আখ থেকে এক ধরনের শক্ত মধু পাওয়া যায়। এগুলো নুনের মতো দানাদার আর দাঁতের নিচে গুঁড়ো হয়ে যায়, কিন্তু স্বাদ মধুর মতোই মিষ্টি।" সেকালে মধু আর চিনি এই দুটো জিনিসই ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

মধ্যযুগে উইরোপে বহুদিন পর্যন্ত আখের চাষ হতো শুধু স্পেনে। স্পেন দেশের লোকেরা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিয়ে সেখানে দাস-শ্রমিকদের দিয়ে আখের চাষ শুরু করে। তারপর এই আখের চাষ আরো অনেক দেশে ছড়িয়ে যায়। আজকালও প্রশান্ত মহাসাগরের ফিজি প্রভৃতি কতকগুলো দ্বীপের লোকদের বিশ্বাস, আদি মানুষের জন্ম হয়েছিল আখের গাছ থেকেই। তারা বলে ঃ সৃষ্টির প্রথমে একটা আখের গাছ থেকে দুটো ডাল বেরোয়; তারপর এই ডাল দুটো ফেটে গিয়ে তা থেকে বেরিয়ে আসে একটা পুরুষ আর একটা মেয়ে।

আখের চিনি আজকাল সব চাইতে বেশি চলে; তা' বলে আখের চিনিই একমাত্র চিনি নয়। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে ফরাসি দেশে বীট নামে এক রকম মূলা জাতীয় গাছের শেকড় থেকে চিনি তৈরি করা শুরু হয়—তাকে বলে বীট চিনি। তাছাড়া কানাডায় মেপল নামে এক রকম গাছের রস থেকেও চিনি তৈরি হয়।

বলছিলাম, চিনি থেকে কত রকমের মজাদার জিনিস তৈরি হয় আর তা আমাদের কাছে খু-উ-ব ভাল লাগে। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছ মিষ্টি জিনিস আমাদের এত ভাল লাগে কেন?

তার জবাবে বলতে হয় মিষ্টি আমাদের শরীরের জন্যে নেহাত দরকারি, তাই। আমরা যে এত রকমের খাবার-দাবার খাই তার আসল কারণ তো হল শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখা, আর তার পুষ্টি হওয়া। আমাদের শরীরটা দিন রাত খাটছে ইঞ্জিনের মতো। আর যে কোন ইঞ্জিন চলবার জন্যেই জ্বালানি দরকার, তাপের দরকার। এই তাপের বড় অংশটা আসে আমাদের খাবার-দাবারের চিনির ভাগ থেকে।

আমাদের শরীরের জন্যে দরকারি কতটা তাপ কোন খাবার থেকে তৈরি হয় তা মাপা হয় ক্যালরির হিসাবে। এই হিসাব মতো অন্যান্য ভাল খাবারের তুলনায়

চিনির ক্যালরির পরিমাণ কত বেশি সেটা দেখলেই বোঝা যাবে চিনি কেন এত দরকারি জিনিস। এক কেজি গোল আলুতে যেখানে আছে ৯০০ ক্যালরি, আর মুরগির মাংসে ১১০০ ক্যালরি, সেখানে এক কেজি চিনিতে কত ক্যালরি আছে, শুনবে? প্রায় ৩৯০০ ক্যালরি। চাট্টিখানি কথা নয়।

এ-থেকে আরো বোঝা যায়, ছোট ছেলেমেয়ে যারা ছুটোছুটি করে বেড়ায় তাদের শরীরে চিনির দরকার সব চাইতে বেশি। দুঃখের কথা হল, এই সোজা ব্যাপারটা বড়রা সব সময় বুঝতে পারেন না!

চিনি মানুষের শরীরে শক্তি যোগায়। অনেক দূরের পথ হেঁটে একজন যদি খুব হয়রান পেরেশান হয়ে আসে, তাহলে তাকে এক গ্লাস চিনির শরবত দেবার নিয়ম; সঙ্গে সঙ্গে হয়রানি দূর হয়ে গিয়ে সে চাঙ্গা হয়ে ওঠবে।

কিন্তু শুধু খাওয়ার জন্যেই নয়। চিনির আজকাল নিত্য নতুন ব্যবহার বেরুচ্ছে। সব এক সঙ্গে করে বলা যায়, খাওয়া ছাড়াও মানুষ আজ চিনিকে প্রায় তিন হাজার রকম উপায়ে ব্যবহার করছে। তার মধ্যে ধর একটা হচ্ছে কাঁচা চামড়া ট্যান করতে। যে ওষুধ দিয়ে চামড়া পাকা করতে হয় তার সাথে একটুখানি চিনি মিশিয়ে দিলে চামড়া নাকি অনেক ভাল ট্যান হয়। কাচের শিল্পে কাচ থেকে কলাই করে আয়না তৈরি করতেও আজকাল যথেষ্ট পরিমাণে চিনি ব্যবহার করা হচ্ছে।

চিনির সাহায্যে প্লাস্টিককে করা হচ্ছে মজবুত আর কম ভঙ্গুর। অ্যান্টিসেপটিক ওষুধ, বিষ, কৃত্রিম রবার, কাগজ, রঙ, বিস্ফোরক দ্রব্য পেনিসিলিন, প্রসাধনী এ সব জিনিস তৈরিতেও চিনির ব্যবহার আছে। এমন কি আখের ছোবড়াও বাদ যায় নি; নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ছোবড়া থেকে তৈরি হচ্ছে দামী নাইলন।

তাছাড়া আরো ব্যাপার রয়েছে। যে সব জিনিস টক তাদের এক কথায় অ্যাসিড বা অম্ল বলা যেতে পারে। রসায়নশাস্ত্রে এই অ্যাসিড না হলে এক মুহূর্ত চলে না, এমনি দরকারি জিনিস এটা। তার মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড বলে এক রকমের অ্যাসিড গোড়াতে তৈরি করা হত দুধ থেকে; এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন, খালি দুধ থেকে নয়, ওই ল্যাকটিক অ্যাসিড চিনি থেকেও তৈরি করা যেতে পারে।

এমনি আর একটা অম্ল সাইট্রিক অ্যাসিড; আগে পাওয়া যেত শুধু টক লেবুজাতীয় ফল থেকে। এখন এটাও চিনি থেকে তৈরি করবার উপায় বেরিয়েছে।

এতদিন লোকে ভাবতো, মিষ্টি খেলে বাচ্চাদের দাঁত খারাপ হয়ে যায়। এখন দেখা যাচ্ছে, কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। অন্তত তোমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, বেশি মিষ্টি খেলেই যে দাঁত বেশি ক্ষয় হবে এমন কোন কথা নেই। সেটা অনেকখানি নির্ভর করে খাদ্যের সাধারণ পুষ্টির ওপর; আর মিষ্টি খেয়ে দাঁত পরিষ্কার করা হচ্ছে কিনা তার ওপর।

ডাক্তারি শাস্ত্রেও চিনির অনেক ব্যবহার রয়েছে। বেশি রক্তপাতের ফলে রোগীর অবস্থা সঙ্গিন হয়ে দাঁড়ালে তার শরীরে বাইরে থেকে ইঞ্জেকশন করে রক্ত দিতে হয়, তা বোধ হয়, তোমরা জানো। সুস্থ মানুষের রক্ত নিয়ে তার সারাংশ—প্লাজমা বা রক্তরস বোতলে পুরে হাসপাতালে জমিয়ে রাখা হয়। এই রক্তরস খুব তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধে যায়, আর তা হলেই জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল। একে সংরক্ষণ করবার জন্যে চিনি ব্যবহার করা হয়।

তাহলেই এখন বোঝ, চিনি যে শুধু খাবার জন্যেই দরকার তা নয়। অন্যান্য যে সব কাজে আজকাল চিনির ব্যবহার হচ্ছে দরকারের দিক দিয়ে সেগুলোও কিছু কম যায় না।

প্রায় সব গাছপালাই চিনি তৈরি করে—কোন গাছ বেশি, কোনটা বা কম। গাছের সবুজ পাতা সূর্যের আলো থেকে নেয় শক্তি, মাটি থেকে নেয় পানি, আর হাওয়া থেকে নেয় কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস। তারপর এক আশ্চর্য রাসায়নিক উপায়ে এসবের সাহায্যে তৈরি করে চিনি আর অক্সিজেন। এই গাছ থেকেই মানুষ বের করে নেয় তার দরকারি চিনি।

সব চেয়ে সুখের কথা হল, বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীতে যত রকমের গাছপালা আছে তার চার ভাগের তিন ভাগ থেকেই চিনি সংগ্রহ করা যায়।—তাহলে আমরা অন্তত এটুকু আশা অনায়াসেই করতে পারি যে, দুনিয়ার বুকে চিনির মতো একটা অতি উপাদেয় জিনিসের অভাব কোনদিনই হবে না। কি বল তোমরা ?

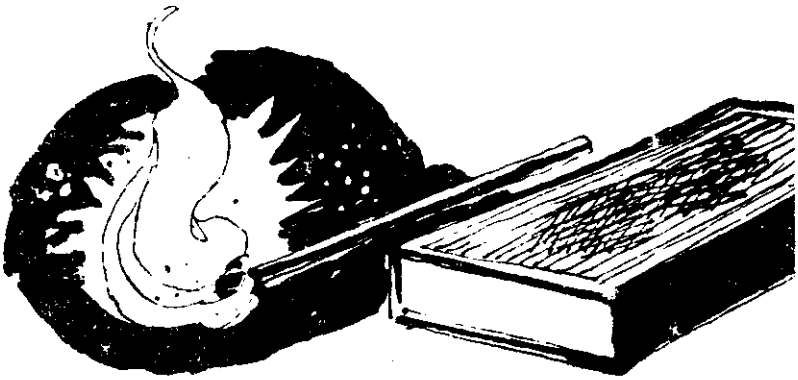

আগুন!
আগুন!

আজ থেকে বহু যুগ আগে—সন-তারিখের হিসাব ধরলে আড়াই হাজার বছরের কম হবে না—একদল পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা ভেবে ভেবে বের করেছিলেন আমাদের এই পৃথিবী গোড়ায় পাঁচটা জিনিস দিয়ে তৈরি। সেই আদত জিনিসগুলো হল —মাটি, পানি, আগুন, বাতাস আর আকাশ। তাঁদের কঠিন পণ্ডিতী ভাষায় বলতে গেলে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ আর ব্যোম। পৃথিবীর এই পাঁচটা গোড়ার উপাদানকে তাঁরা বললেন 'পঞ্চভূত' বা পাঁচটা ভূত।

সেই পাঁচটা ভূতের একটা ভূত হল আগুন। তাঁরা বললেন, আগুন আমাদের জীবনের সাথে একেবারে মিশে আছে, আগুন না হলে আমাদের একেবারেই চলে না। তাই আগুন হল দুনিয়ার পাঁচটা একেবারে গোড়ার জিনিসের একটা।

সেই এত পুরনো যুগের লোকেরা যদি আগুনের এমন দাম দিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের আজকের এই সভ্য জীবনে আগুনের দাম তো আরো অনেক বেশি হবার কথা।

তখনকার মানুষ বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত; শিকার করে ফলমূল খেয়ে থাকত। সামান্য চাষবাসও তারা শিখেছিল। রান্নার জন্যে, বুনো জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আর জন্তু-জানোয়ারকে তাড়িয়ে নিয়ে শিকার করবার জন্যে তাদের আগুনের দরকার হত।

আমাদের আজ যে শুধু ঘরের কাজ-কর্মের জন্যেই আগুনের দরকার, তা নয়। আগুন না হলে রেলগাড়ি, জাহাজ, উড়োজাহাজ, কোন রকম যানবাহনই তো চলবে না। আগুনের অভাবে সব রকমের কল-কারখানার চাকা বন্ধ হয়ে যাবে —কাপড়-জামা, নুন, চিনি, ঘড়ি, সাইকেল এসব রোজকার দরকারের কোন জিনিসই আর তৈরি হবে না। এক কথায় আমাদের জীবনযাত্রাই অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আগুন এমন কাজের জিনিস বলেই আগুনের কথা জানাটাও আমাদের সবার জন্যেই দরকার। আর এর কথা ভাল করে জানলেই একে আমরা আরও বেশি করে কাজে লাগাতে পারব।

আগুনের ব্যবহার যে সেই কোন আদ্যিকালে শুরু হয়েছিল, তা আজ আর ঠিক করে বলবার উপায় নেই! যে-ই এর ব্যবহার আবিষ্কার করে থাকুক, এটা মানুষের সভ্যতার জন্যে এমনই জরুরি যে, সেদিক থেকে একমাত্র মানুষের ভাষা, হরফের সাহায্যে লেখা আর কৃষির আবিষ্কারকেই এর সাথে তুলনা করা চলে।

যতদূর জানা যায়, আগুন তৈরি করতে শেখার আগেই মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখেছিল। বড় বড় বনে শুকনো গাছের ডালে ডালে ঘষা লেগে দাবানল জ্বলে ওঠত; মানুষ দেখত বুনো পশু-পাখি বন ছেড়ে পালাচ্ছে। ঝড়ো মেঘ থেকে বাজ পড়েও কখনো কখনো শুকনো গাছপালায় আগুন ধরে যেতো। মানুষ দেখত আগুনের কাছে দাঁড়ালে শীতের হাত থেকে বাঁচা যায়; আগুন জ্বালানো থাকলে বুনো জন্তু -জানোয়ার সেখানে ঘেঁষে না। এমনি করেই আগুন হয়ে দাঁড়াল মানুষের আত্মরক্ষার আর আরামের একটা বড় রকমের উপকরণ ।

হয়তো কোনদিন শিকারের মাংস হঠাৎ ফসকে আগুনে পুড়ে ঝলসে গেল; মানুষ খেতে গিয়ে দেখল আগুনে পুড়ে মাংসটা যেমন নরম হয়েছে, তেমনি হয়েছে সুস্বাদু। এমনি করেই হল আগুন দিয়ে রান্নার সূত্রপাত।

কিন্তু তখন নিজের হাতে আগুন তৈরি করতে মানুষকে বড় বেগ পেতে হত। দুটো শুকনো কাঠের চেলা জোরে জোরে ঘষে তারা আগুন জ্বালাত। কখনো নরম পাতলা কাঠের গায়ে ফুটো করে তার ভেতর একটা শক্ত কাঠের কাঠি ঢুকিয়ে দুহাতের তালু দিয়ে জোরে ঘোরানো হত; তাতেই জ্বলে ওঠত আগুনের ফুলকি।

তারপর কোন এক জায়গায় সব সময়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত; সবাই দরকারমতো সেখান থেকে আগুন নিয়ে যেত। আজকালও অস্ট্রেলিয়ার কোথাও কোথাও আদিম অধিবাসীরা এমনি করে আগুন জ্বালায়, আর সে আগুনকে জিইয়ে রাখে।

আগুন এমন দরকারী বলেই, আর তা মানুষের ভয়ংকর রকম ক্ষতি করতে পারে বলেই, সেই আদ্যিকাল থেকে আগুনকে দেবতা মনে করে পুজো করা শুরু হয়। প্রাচীন আর্যদের আগুনের দেবতার নাম হল 'অগ্নি'। এখনও পারসিরা আগুনকে পুজো করে; তাদের পুজোর মন্দিরে সব সময় আগুন জ্বালিয়ে রাখবার সেই পুরনো রেওয়াজ আজও চালু আছে। এই আগুন নিভে যাওয়াকে তারা এক ভয়ংকর অমঙ্গলের চিহ্ন বলে মনে করে।

কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালানো ছাড়া আগুন জ্বালাবার আরো কায়দা পরে আবিষ্কৃত হয়। কেউ হয়তো একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করল, লোহার সঙ্গে চকমকি পাথর ঠুকলে আগুন জ্বলে ওঠে, তা থেকে শুকনো ঘাস-পাতায় আগুন ধরানো যায়। এই কায়দাটাই উন্নত করে আজকালকার সিগারেট লাইটার তৈরি হয়েছে। আজকাল যেমন একটা দিয়াশলাই-এর বাক্সের গায়ে এর রাসায়নিক মশলা মাখানো কাঠি ঠুকলেই দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে, আগে আগুন জ্বালানো মোটেই অত সহজ ছিল না।

তোমাদের মনে নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন জাগছে ঃ কিন্তু আগুন জিনিসটা আসলে কি? আর আগুন কি করেই বা জ্বলে ওঠে। বিজ্ঞানীরা বলেন, কোন জিনিস যখন খুব তাড়াতাড়ি হাওয়ার অক্সিজেন গ্যাসের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশতে থাকে, তখন প্রচুর আলো আর তাপের সৃষ্টি হয়—আর তাকেই আমরা আগুন জ্বলা বলি। মনে রেখো, অক্সিজেনের সঙ্গে যোগ হওয়াটা বেশ তাড়াতাড়ি ঘটা চাই, তা নইলে কিন্তু আগুন জ্বলবে না। লোহা বাইরে ফেলে রাখলে যে মরচে পড়ে, তাও আসলে অক্সিজেনের সঙ্গে লোহার যোগ। কিন্তু সে যোগটা হল ধীরে ধীরে—তাই তাকে আগুন জ্বলা বলব না।

অনেক সময় কঠিন বা তরল জিনিস সরাসরি অক্সিজেনের সঙ্গে তাড়াতাড়ি মিশতে পারে না। তার জন্যে দাহ্য উপাদানটা আগে বাষ্পে পরিণত হওয়া দরকার। মোমবাতি প্রদীপের সলতের কাছে যখন আগুন ধরা হয় তখন খানিকটা মোম বা তেল প্রথমে বাষ্প হয়ে যায়। তারপর সেই বাষ্প হাওয়ার অক্সিজেনের সাথে মিশে জ্বলতে থাকে। যে অংশটা অক্সিজেনের সঙ্গে মেশে না সেটা হয় তৈরি করে ধোঁয়া আর নইলে ছাই হিসেবে তলায় পড়ে থাকে।

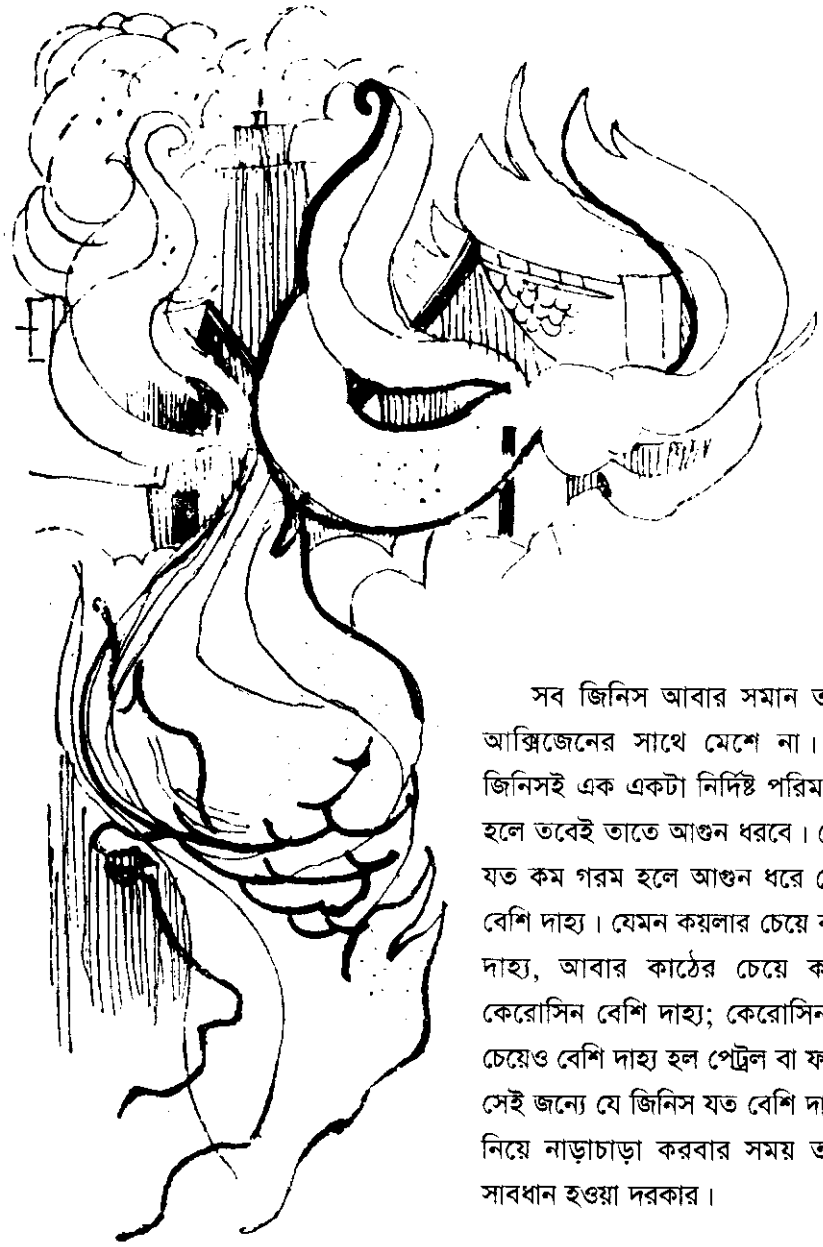

সব জিনিস আবার সমান তাড়াতাড়ি আক্সিজেনের সাথে মেশে না। প্রত্যেক জিনিসই এক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে গরম হলে তবেই তাতে আগুন ধরবে। যে জিনিস যত কম গরম হলে আগুন ধরে সেটা তত বেশি দাহ্য। যেমন কয়লার চেয়ে কাঠ বেশি দাহ্য, আবার কাঠের চেয়ে কাগজ বা কেরোসিন বেশি দাহ্য; কেরোসিন তেলের চেয়েও বেশি দাহ্য হল পেট্রল বা ফসফরাস। সেই জন্যে যে জিনিস যত বেশি দাহ্য, সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সময় তত বেশি সাবধান হওয়া দরকার।

দাহ্য জিনিস নাড়াচাড়া করবার অসাবধানতার দরুন অনেক মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। শুধু এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিসাব নিলে দেখা যায়, সেখানে প্রতি বছর অগ্নিকাণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক মারা যায়; আরো যে কত লোক জখম হয়, তার ইয়ত্তাই নেই। সে দেশে প্রতি বছর আগুন লাগার ফলে লোকসান হয় কয়েক শো কোটি ডলার—আগুন যে কী দারুণ 'ভূত' এ থেকেই তা বোঝা যায়।

আমাদের দেশেও বছর বছর এই ভূতের হাতে ক্ষতি কিছু কম হয় না। সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গ থেকে হয়তো কোথাও আগুন লাগে। সময়মতো নেভানো না হলে হাওয়ায় সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। অনেকের বাড়ি পোড়ে, অনেক মানুষ ঘড়হারা হয়। অনেক সময় বড় বড় পাটের গুদামে আগুন লেগে বহু কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়।

আগুনের এই ভূত যাতে আমাদের ক্ষতি করতে না পারে, তার জন্যে একে নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় খুব সাবধান!

ফে ল না
থে কে
খে ল না

হারুন হচ্ছে এমন ধরনের ছেলে যাকে রাস্তায় বেরুলেই অন্তত সাত বার আফসোস করতে হবে। হয়তো গরমের দিনে ডাবের দোকানের সামনে ডাবের খোলার কাঁড়ি জমে রয়েছে। দেখে হারুন জিব আর তালুতে এক রকম অদ্ভুত শব্দ করে বলবে ঃ আঃ এগুলোকে কী চমৎকার কাজে লাগানো যেত। দেশের কত জিনিস নষ্ট হচ্ছে এমনি করে।

এমনকি হারুনের রাস্তায় বেরোবারও দরকার করে না। বাড়িতে হয়তো কাঠের গুঁড়ো দিয়ে চুলোয় জ্বাল দেওয়া হচ্ছে, কিংবা আখ খেয়ে কেউ ছোবড়া ফেলে রেখেছে। হারুন দেখলে খামখা খানিকটা মেজাজ দেখিয়ে দেবে ঃ বলি এগুলো কি এমনি করে নষ্ট করবার জিনিস?—কত কাজ হয় এসব থেকে!

আসল ব্যাপারটা হল হারুনের নাকি একটা প্লাস্টিকের ফ্যাক্টরি খোলার ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে; সেখানে সে নানা রকম ফেলনা জিনিস থেকে চমৎকার চমৎকার খেলনা তৈরি করবে। খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া এসব গোপন খবর অবশ্য সে বিশেষ কারো কাছে বলে না।

প্লাস্টিকের কথায় হারুন একেবারে পঞ্চমুখ। কথায় কথায় বলবে ঃ দেখ প্লাস্টিকের জিনিস আজ আমাদের জীবনের চারদিক একেবারে ঢেকে দিয়েছে। দাঁত মাজবার যে ব্রাশটা তার আগা গোড়াই প্লাস্টিকের তৈরি; চুল আঁচড়াবার চিরুনি, লিখবার কলম, চশমার ফ্রেম, টেলিফোনের হাতল, খোকার খেলনা, এ সবই প্লাস্টিকের। তার ওপর আজকাল আবার প্লাস্টিকের জুতো-মোজা, খাবার বাসন, কাপ-প্লেট, চামচ, এমন কি নকল দাঁত-চোখ-নাকও বেরিয়েছে। কত রকমের কল-কবজা যন্ত্রপাতির অংশ যে আজ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

সেদিন বৈঠকখানায় বসে গল্প করতে করতে কি করে একটা চায়ের কাপ ভেঙ্গে গিয়েছে। টুলু হঠাৎ বলে ওঠল ঃ কি হারুন, এ পেয়ালাটাও তো আশা করি তোমার প্লাস্টিকের তৈরিই ছিল!

টুনু মাঝখান থেকে ফোঁড়ন কাটল ঃ বুঝলাম না কথাটা। এ দেখছি কাচের পেয়ালা, প্লাস্টিক আবার এলো কোত্থেকে।

হারুন চটে গেল ঃ কি আশ্চর্য; কাচের পেয়ালা বলে প্লাস্টিক হতে জানে না; জানো, কাকে বলে প্লাস্টিক? সারাদিন তো বলে বেড়াবে আমার বেল্টটা প্লাস্টিকের, ঘড়ির ব্যাণ্ডটা প্লাস্টিকের, কলমটা প্লাস্টিকের, প্লাস্টিকের হেনটা তেনটা। এই সবুজ পেয়ালাটা যে প্লাস্টিকের ছিলনা কে বললে তোমাকে? না জেনে শুনে কেবল—

টুলু বলল, বেশ তো আজ না হয় তোমার কাছে প্লাস্টিকের কথাই শোনা যাক। বল শুনি প্লাস্টিক কাকে বলে। হারুন তখন টেবিলের কিনারার ওপর ঠেস দিয়ে বসে পকেট থেকে ফস করে কলমটা টেনে নিয়ে বেশ ভারিক্কি চালে রীতিমতো বক্তৃতা আরম্ভ করল ঃ

এই যে দেখছ কলমটা, এটা এখন বেশ শক্ত, মেঝেতে ফেলে দিলেও ভাঙ্গবে না। এটা বরাবরই কিন্তু এ-রকম ছিল না। প্রথমে এটা ছিল নরম কাদার মতো, তখন তাকে ছাঁচে ফেলে এই কলম বানানো হয়েছে। এমনি ধাঁচের জিনিস, যেগুলো বেশ কাদা কাদা—মডেল করবার 'পুটি'র মতো—তাদের নাম হল প্লাস্টিক। হাত

দিয়ে বেশ চটকানো যায়—অর্থাৎ যাকে সাধু ভাষায় বলে নমনীয়—টিপে-টুপে চাপ দিয়ে যেমন ইচ্ছে আকার দেওয়া যায়। টানো, কেমন লম্বা হয়ে যাচ্ছে; দলা পাকাও, গোল হয়ে যাবে। এই যেমন, কাচ।

একটা কাচের জিনিস নিয়ে গরম দাও। দেখবে, কেমন গলে গলে নরম হয়ে যাচ্ছে—ইচ্ছেমতো বাঁকানো যায়; টেনে লম্বা করা যায়। কাচের জিনিস তৈরির কারখানায় যাও। সেখানে দেখবে, লোকেরা লোহার নলের ডগায় কী সুন্দর তাল তাল গলা কাচ নিয়ে ইচ্ছেমতো ফোলাচ্ছে, দোলাচ্ছে, চাপ দিয়ে ছাঁচের ভেতর থেকে বের করে আনছে বোতল, শিশি, চিমনি, পেয়ালা—এমনি কত কী।

আদতে সব প্লাস্টিকই এই রকম—বেশ কাদা কাদা হবে। কিন্তু খালি কাদা হয়ে থাকলেই তো আর চলবে না—তারপর যদি আবার শক্ত না হল তাহলে আমরা অমন চমৎকার চমৎকার প্লাস্টিকের জিনিস পাব কি করে?

তাহলেই বুঝতে পারছ প্লাস্টিককে শুধু কাদা থাকলেই চলবে না। কোন রকমের দরকারি কাজে লাগাতে হলে তাকে আবার সময় মতো শক্ত হতে হবে। এক রকম প্লাস্টিক হচ্ছে কাচের মতো। আগুনের তা দিয়ে গরম কর, কাদা কাদা

চটচটে হবে; ঠাণ্ডা কর, দেখবে কোন এক জাদুর জোরে একেবারে লোহার মতো শক্ত হয়ে গিয়েছে। যতক্ষণ গরম ছিল খুশিমতো কুমোরের চাকে মাটির তালের মতো তাকে দিয়ে যে কোন জিনিস গড়া যেত। কিন্তু শক্ত হবার পরে আঙ্গুল দিয়ে হাজার টিপেও আর তাকে নরম করা যাবে না। আবার আগুনে তাপ দাও—দেখবে, কেমন সুড়-সুড় করে গলতে আরম্ভ করছে।

সেলুলয়েড, পলিইথাইলিন (বাজারে যার স্বচ্ছ পাত দিয়ে নানা রকম সওদা মোড়া থাকে), পলিস্টাইরিন, নাইলন—এগুলো হল এই জাতের প্লাস্টিক। গরম আর চাপের কাছে এরা একেবারে কাবু; যতবার গরম আর চাপ দেবে ততবারই নরম হবে।

এগুলোকে সবসুদ্ধ এক দলে ফেলে আলাদা করে রাখা যায়। এদের একটা কট্‌মটে ইংরেজি নাম আছে—নামটা হল 'থার্মোপ্লাস্টিক'। থার্মো-মিটার দেখেছ তো? থার্মো কথাটার মানে হল তাপ। অর্থাৎ কিনা যে প্লাস্টিকের ওপর গরম বারে বারেই খাটানো যাবে।

এছাড়া আর এক জাতের প্লাস্টিক আছে এগুলোর মেজাজ আবার একটুখানি চড়া। পয়লা বার গরম করার পর চাপ দিলে ঠিকঠাক গলবে, চট্ চটে হবে—তারপর ছাঁচের মধ্যে শক্তও হবে। কিন্তু একবার শক্ত হয়ে গেলে যতই চাপ দাও, সাধ্য-সাধনা কর, কিন্তু এদের আর কোন মতেই গলাতে পারবে না। এদিক থেকে এরা একে বারে অনড় অটল।

এগুলোর ইংরেজি নাম হচ্ছে 'থার্মোসেটিং'—অর্থাৎ যার ওপর তাপ মাত্র একবার খাটানো যায়। এজাতের প্লাস্টিকও আমরা হরদমই দেখি। যেমন বেকেলাইট, মেলম্যাক। বেকেলাইটের রেডিও সেট, বেকেলাইটের সিগারেট কেস আরো—কত কী; মেলম্যাকের পেয়ালা-বাসন আজকাল আমাদের দেশেও তৈরি হচ্ছে। এগুলো সাধারণ গরমে ফাটে না। হাত থেকে পড়লেও ভাঙ্গে না। ভারি সুবিধে!

কি, প্লাস্টিক কাকে বলে এবার বুঝতে পারলে তো?

টুনু অবাক হয়ে ঢোঁক গিলছে ঃ এ কিন্তু ভারি অদ্ভুত; প্লাস্টিকের ভেতর এত কিছু আছে জানতাম না তো! থার্মো-প্লাস্টিকগুলো কেমন মজার; যতবার খুশি ভাঙ্গো আর গড়ো—গলাও আর ঠাণ্ডা কর—সব নিজের খেয়ালখুশি মতো। আর এই থার্মো-সেটিং না কি নাম বললে, ওগুলো তো ভারি বেয়াড়া; একবার শক্ত হলেই আর নরম হবে না?

ঃ আরে আসল রহস্য তো ওখানেই। বড় বড় মাথাওয়ালা বিজ্ঞানীরা তো প্রথমটায় বুঝতেই পারেন না, এমন ধারা কেন হয়। তারপর অনেক রকম পরীক্ষা করতে করতে তাঁরা দেখেন, প্লাস্টিকের ভেতরে সে আবার এক মজার রাজ্য।

সব জিনিসের একেবারে গোড়ার কথা যে অণু আর পরমাণু এক সঙ্গে মিলে মিশে এক একটা করে অণু তৈরি হয়। প্লাস্টিক জাতের জিনিসের ভেতর অণুগুলো হয় বড়সড় আর লম্বা গোছের, বেশ থোকে থোকে সাজানো থাকে। তাই অন্য সব সাধারণ জিনিস গরম করলে পর তার খাটো খাটো অণুগুলো যেমন একেবারে আলাদা হয়ে জিনিসটা একদম গলে যায়, প্লাস্টিকের বেলায় তা হতে পারে না।

গরম পেলে থোক-বাঁধা শেকলের মতো লম্বা অণুগুলো একটু একটু করে পাশ কাটিয়ে সরতে থাকে; আর তাই প্লাস্টিক অমন কাদা কাদা হয়ে দাঁড়ায়। থার্মোপ্লাস্টিককে তাপ দিলে প্রত্যেক থোকসুদ্ধই সরে, থোকের বাঁধন শুধু একটু আলগা হয় মাত্র। যতবার তাপ দেওয়া যায় ততবারই প্লাস্টিক এই ভাবে নরম হতে থাকে। কিন্তু থার্মোসেটিং জাতের প্লাস্টিককে একবার তাপ দিলেই থোকগুলো সব ভেঙ্গেচুরে অণুগুলো বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তাই পরে তাপ দিয়েও তাদের আর নরম করা যায় না।

প্লাস্টিক জাতের জিনিসের রহস্য জানতে পারার পর বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, তাই তো এসব কথা জেনে নিয়ে এখন তো আমরা ইচ্ছেমতোই প্লাস্টিকের জিনিস বানাতে পারি; দুনিয়াতে এত রকমের ফেলনা জিনিস রয়েছে, সেগুলো থেকে যদি দরকারি জিনিস বানিয়ে তাদের কাজে লাগানো যায় তাহলে মন্দ কি!

বিজ্ঞানীদের সে চেষ্টা সফল হয়েছে। আজকে তাই আমরা বাজারে হাজার রকমের প্লাস্টিকের জিনিস দেখতে পাই। শুধু এক আমেরিকাই বছরে বহু হাজার কোটি টাকার প্লাস্টিকের জিনিস তৈরি করে। আমেরিকায় আজকাল যত কাপড়-চোপড় তৈরি হয় তার প্রায় অর্ধেক তৈরি হয় প্লাস্টিক জাতীয় আঁশ থেকে—বাকিটা তুলো, পশম এইসব থেকে। সেখানে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত প্লাস্টিকের তৈরি খেলনার ছাঁচ দিয়ে নানা রকমের প্লাস্টিকের জিনিস তৈরি করে।

এই সব প্লাস্টিক কিসে থেকে তৈরি হয় সে শুনলে তো আরো অবাক হবে। প্লাস্টিক তৈরির প্রধান উপকরণ হল কয়লা, হাওয়া, পানি, চুনাপাথর আর নুন। অবশ্য সব সময় প্লাস্টিকের জন্যে এর সবগুলো দরকার হয় না। যেমন ধর 'পলিইথাইলিন' তৈরি হয় শুধু কয়লা আর পানি থেকে। 'নাইলন' তৈরি করতে চাই

হাওয়া, কয়লা আর পানি। 'মেলম্যাক' তৈরি করতে লাগে কয়লা, পানি আর চুনাপাথর।

অনেক সময় প্লাস্টিকের জন্যে দরকার হয় কাঠের গুঁড়ো, তুলো এই সব সেলুলোজ জাতীয় জিনিস। কাঠের আঁশের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে হয় সেলুলয়েড। সেলুলয়েড দিয়ে তৈরি হয় ফটো তোলার বা সিনেমার ফিলম। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা পাঠখড়ি আর আখের ছোবড়ার আঁশ থেকেও নাইলন তৈরির কায়দা বের করেছেন।

আমাদের দেশের আখের ছোবড়া, কচুরিপানা, কাঠের গুঁড়ো, ধানের তুষ এগুলো হল আবর্জনা। হয় এগুলো ফেলে দেওয়া হয়, নইলে পুড়িয়ে ফেলা হয়। অথচ বিদেশে এই ফেলে দেওয়া বাজে আবর্জনাই আজ কত সুন্দর সুন্দর প্লাস্টিকের জিনিস তৈরি করতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

রোজকার জীবনে ব্যবহারের সামগ্রী থেকে বড় বড় কল কারখানার যন্ত্রপাতি পর্যন্ত কত রকম কাজে যে আজকাল প্লাস্টিকের ব্যবহার হচ্ছে তার হিসাব দেওয়া মুশকিল।

কোন কোন প্লাস্টিক দারুণ শক্ত, কল-কব্জার 'গিয়ার' তৈরি করতে সেগুলো ব্যবহার করা হয়। আবার কোনটা অতি মোলায়েম অথচ কিছুতেই ভাঙ্গবে না। কোনটা কাচের মতো স্বচ্ছ, কোনটা অতি হালকা, কোনটা আগুনে বা অ্যাসিডে নষ্ট হয় না। নানান জাতের নানান গুণের প্লাস্টিক মিশেল দিয়ে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন কাজের জন্যে ঠিক দরকার মতো গুণাগুণের প্লাস্টিক।

হঠাৎ টুলু জিজ্ঞেস করল ঃ আচ্ছা, আমাদের দেশে বড় একটা প্লাস্টিকের কারখানা খুলতে হলে কি কি জিনিস লাগবে, বলতো।

হারুন বলল ঃ প্রথমে চাই কল চালাবার জন্যে বিজলি। তারপর দরকার প্লাস্টিকের কাঁচামাল ঃ কয়লা, হাওয়া, পানি, প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর এছাড়া চাই লম্বা লম্বা আঁশওয়ালা কৃষিজাত জিনিস—যেমন, বাঁশ, তুলো, কাঠ, এই সব। এ সবই আমাদের দেশে আছে। তাছাড়া আরো আছে বহু রকমের ফেলনা জিনিস। তোমরা দেখে নিও বাংলাদেশে সবচেয়ে সেরা প্লাস্টিকের কারখানা হবে হারুন এণ্ড কোং....

অন্তর্ভুক্তি নং.
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

আ ট কে গে লো দ ম !

কতক্ষণ থাকতে পারো তুমি দম আটকে?

আধ মিনিট! পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ড! চল্লিশ সেকেণ্ড! পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড, আচ্ছা, না হয় ধরো পঞ্চাশ সেকেণ্ডই থাকলে!

কি? ও সব আন্দাজের ওপর বুঝি হচ্ছে না? বেশ! তাহলে যোগাড় কর একটা 'চুপ-ঘড়ি'। চাই কি, তোমাদের স্কুলেও থাকতে পারে। স্পোর্টসের সময় খেলার মাঠে দরকার হয়। ইংরেজিতে ওকে বলে 'স্টপ-ওয়াচ'। আমরা বাংলায় তার নাম দিলাম 'চুপ-ঘড়ি'!

এই চুপ-ঘড়ি দিয়ে সময়ের হিসাব মাপা হয় কেমন করে বলি। মনে কর একজন দৌড়চ্ছে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব। তার দৌড়তে ক' মিনিট, ক' সেকেণ্ড আর এক সেকেণ্ডের ক' ভাগ সময় লাগল তা সাধারণ ঘড়ি দিয়ে খুব নিখুঁতভাবে মাপা যায় না। তাই তখন চুপ ঘড়ি ব্যবহার করতে হয়। চুপ ঘড়িকে ঠিক সময়ে টুক করে চালিয়ে দেওয়া যায়, আবার ঠিক সময়ে ঝট করে বন্ধ করা যায়। তাই এটা ঠিক ঠিক বলে দেয় মিনিট আর সেকেণ্ডের হিসাব।

চুপ ঘড়ির কাঁটা প্রথমে শূন্যতে রাখতে হবে। এখন ঘড়ি চালিয়ে দিয়ে দম বন্ধ কর। আগেই অনেকটা শ্বাস বুকের ভিতর টেনে নিয়েছিলে তো? এবার চোখও বন্ধ করে ফেল। কেউ হয়তো হাসিয়ে দেবে; কিংবা ঘড়ির দিকে তাকালে, চাই কি, নার্ভাসও হয়ে পড়তে পারো।

কি? মনে হচ্ছে বুঝি চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো—আলো নেই, বাতাস নেই, চারদিক কেবল ঘুটঘুটে অন্ধকার। উঃ! দম বুঝি এক্ষুণি আটকে গেলো।

এমনি যখন লাগবে তখন টুক করে চুপ-ঘড়িতে টোকা দিয়ে দম ছেড়ে দাও। চোখ মেলে দেখ এবার। ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। ঘড়ির কাঁটা যেখানে থেমেছে সেখানে গুনে দেখ ক' সেকেণ্ড হয়েছে। অবশ্য চুপ-ঘড়ি না পেলে সেকেণ্ডের কাঁটাওয়ালা অন্য ঘড়ি দিয়েও পরীক্ষাটা করা চলবে।

আচ্ছা, কেউ একজন এসে যদি বলে, এক্ষুণি এক সাধু বাবাজীকে দেখে এলাম, তিনি যোগবলে চব্বিশ ঘণ্টা দম বন্ধ করে থাকতে পারেন, তাহলে শুনতে কেমন লাগবে তোমার? প্রথম চোটে খবরটা বিশ্বাসই করতে চাইবে না তুমি। তুমি কিনা পুরো একটা মিনিটও দম বন্ধ করে থাকতে পারছোনা—মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীতে খালি সরষে ফুল ফুটছে। আর ওই সাধু বাবাজী চব্বিশ ঘণ্টা দম আটকে নিয়ে বসে থাকবে!

কিন্তু তোমার বিশ্বাস না হলেও মাঝে মাঝে এ-রকম সব ব্যাপার নিয়ে পশ্চিমের দেশে দারুণ রকমের হইচই হয়। ওদেশের লোকেরা এসব শুনে মনে করে, পুবদেশের লোকেরা সবাই বুঝি আশ্চর্য যোগ আর জাদুবিদ্যা দেখাতে ওস্তাদ।

কয়েক বছর আগে এমনি একটা ব্যাপার নিয়ে বিলেতের সবগুলো খবরের কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছিল। রহমান বে নামে এক মিসরীয় জাদুকর যোগবলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় চারদিক বন্ধ লোহার তৈরি ছোট গোসলের চৌবাচ্চার মধ্যে এক ঘণ্টা শুয়ে থেকে সমস্ত লোককে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। রহমান বে জানায় যে, সে ভারতীয় যোগীদের কাছে এই আশ্চর্য যোগবিদ্যা শিখেছে। সে চৌবাচ্চাসুদ্ধ তার ছবি আর জাদুর বিস্তারিত বিবরণ বিলেতের বড় বড় সব খবরের কাগজে ছাপা হয়ে বেরুলো।

আসলে ব্যাপারটার মধ্যে কিন্তু ভৌতিক বা অলৌকিক কিচ্ছু নেই। চৌবাচ্চাটা খুব ছোট হলেও তার আয়তন দেওয়া হয়েছিল লম্বায় ৮ ফুট, চওড়ায় ১ ফুট ৬ ইঞ্চি আর উঁচুতে ২ ফুট। তার মানে ওতে সবসুদ্ধ বাতাস ধরে ২৪ ঘন ফুট(প্রায় ·৬৮ ঘনমিটার)। লোকটার আয়তন হিসাবে ৪ ঘন ফুট বাদ দিলেও রহমান বে-র জন্যে আরো তো অন্তত ২০ ঘনফুটের মতো হাওয়া বাকি থাকে।

এদিকে আমরা জানি, হাওয়ায় অক্সিজেনের পরিমাণ হল মোটামুটি পাঁচ ভাগের এক ভাগ; বাকি প্রায় সবটা নাইট্রোজেন। অর্থাৎ ২০ ঘন ফুট হাওয়ায় অক্সিজেন থাকে ৪ ঘন ফুটের একটু ওপরে।

এবারে দেখা যাক এক ঘণ্টায় রহমান বে-র জন্যে কতটুকু অক্সিজেনের দরকার। সাধারণ একজন লোক অল্পসল্প কাজ করলে ২৪ ঘণ্টায় ২৪ ঘন ফুটের মতো অক্সিজেন ব্যবহার করে। কাজ না করে একদম চুপচাপ পড়ে থাকলে এই পরিমাণ কমে অর্ধেকে এসে দাঁড়ায়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে এক ঘণ্টায় রহমান বে-র দরকার ছিল মাত্রই আধ ঘন ফুটের মতো অক্সিজেন। অর্থাৎ তার জন্যে যথেষ্ট বাড়তি অক্সিজেন রয়ে যাচ্ছে এই এক ঘণ্টার শেষে। ইচ্ছে করলে এর পর আরো ঘণ্টা দুই সে অনায়াসেই ঐভাবে কাটিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু তাতে শেষের দিকে বাতাসে অক্সিজেনের ভাগ কম থাকতো বলে তার বিচ্ছিরি রকম মাথা ধরার সম্ভাবনা ছিল। বন্ধ সিনেমা হলে তিন ঘণ্টা বসে থাকার পর বেরোলে যেমন অনেক সময় মাথা ধরে যায় তেমনি।

তাহলে এবার বুঝতে পারলে বন্ধ কবরে কিম্বা চৌবাচ্চার ভেতরে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়ে পুরস্কার বা বাহবা নেবার মধ্যে খুব বাহাদুরির ব্যাপার কিছু নেই। মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারে আমাদের কতকগুলো সাধারণ জ্ঞানের দস্তুরমতো অভাব রয়েছে বলেই আমরা এগুলো দেখলে, বা এসবের কথা শুনলে এমন অবাক হই।

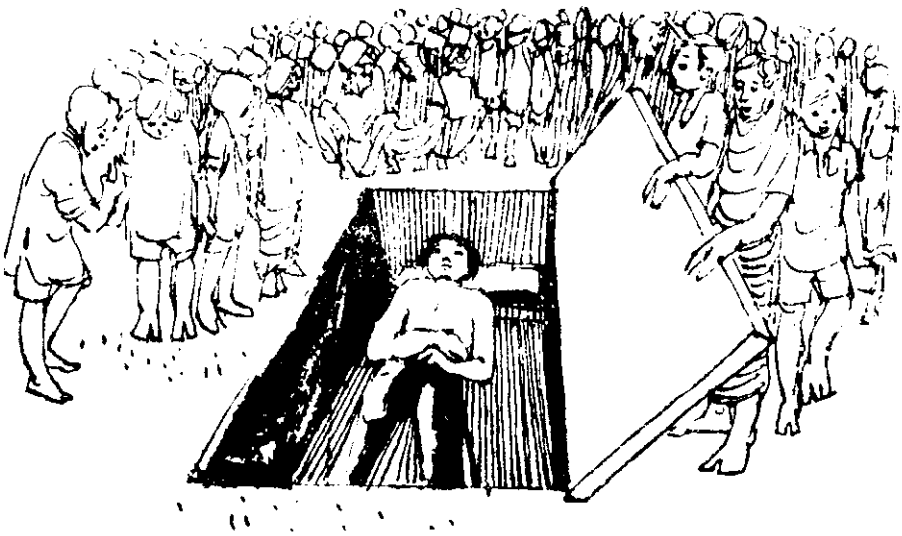

আর এই জ্ঞানের অভাবের জন্যেই বিশুদ্ধ খোলা হাওয়ার দাম আমরা বুঝি নে। শহরে খোলামেলা ময়দান না রেখে ঘন ঘন ঘড়-বাড়ি উঠিয়ে আমরা শহরকে ঘিঞ্জি করে তুলি। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে রেখে হাওয়ার পথ আগলে রাখি। আর গাড়ির ধোঁয়ায় বা কল-কারখানার চিমনির ধোঁয়ায় চারদিকের হাওয়া বিষাক্ত হয়ে ওঠলেও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করি নে।

দূষিত হাওয়া যে কত মারাত্মক হতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডন শহর প্রচণ্ড কুয়াশায় ঢেকে যায়। আর এই কুয়াশায় ধোঁয়া এবং ময়লা আটকে গিয়ে শ্বাস নেবার এমন অসুবিধে ঘটায় যে, তাতেই পাঁচ দিনে প্রায় চার হাজার লোক মারা পড়ে।

হয়তো ভাবছ, এত সব হিসাব-পত্তর করে এই কথাগুলো বলার কী এমন দরকার ছিল? হ্যাঁ, ছিল বৈকি! মানুষের শ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে কতখানি হাওয়ার দরকার, হাওয়ায় অক্সিজেনের ভাগ কতখানি থাকা চাই, এসব ব্যাপার খনিতে বা কল-কারখানার বাতাস চলাচলের অবস্থা করার জন্যে খুব কাজে আসে। যুদ্ধের সময় বিষাক্ত গ্যাসের প্রতিরোধেও কাজে লাগে।

দিন রাতের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের হাওয়া না হলে চলে না। হাওয়ায় রয়েছে আমাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন—অক্সিজেন গ্যাস। বিশুদ্ধ হাওয়া ছাড়া তাই সুস্থ জীবনের কথা কল্পনা করা যায় না।

আমাদের দেশে ক্রমে ক্রমে নানা রকম শহর বন্দর কল-কারখানা ইত্যাদি গড়ে ওঠেছে। শহরে বন্দরে মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। বাড়ছে কল-কারখানার চিমনি থেকে বেরোনো ধোঁয়া, দৃশ্য আর অদৃশ্য ধুলো, হাওয়ায় নানা রকম বিষাক্ত গ্যাস। আর তেমনি বাড়ছে আমাদের চারপাশের হাওয়া দূষিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। কাজেই দেশের সব মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে এসব কথা ভাবতে হবে বৈ কি!

ঘড়ি চলে টিক্ টিক্

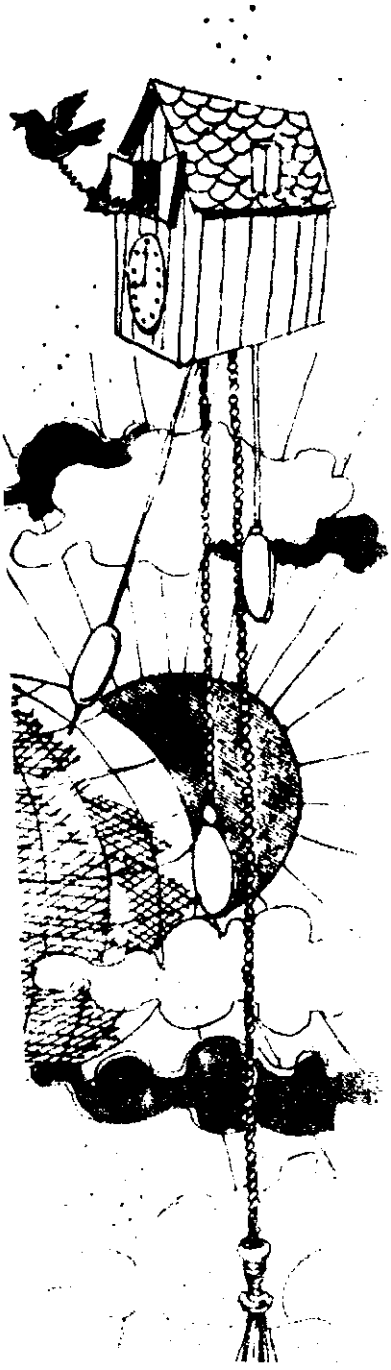

বাংলাদেশ হবার পর বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করে শেষটায় নীলুরা করাচি থেকে ঢাকায় এলো। হাওয়াই জাহাজে আসতে বেশ লাগছিল তীর। রাশি রাশি তুলো-পেঁজা মেঘের ওপর দিয়ে কত মাঠ-ঘাট নদী-নালা পেরিয়ে, ঝকঝকে আলোমাখা ঢাকা..... ঢাকা।

হ্যাঁ, কতো দিন কতো আশা করে..... করে.....শেষটায় সত্যি সত্যি তারা ঢাকায় এলো তাহলে! নীলুর মামা কোন্ এক কলেজের প্রফেসর, প্রথমে তাঁর বাসাতেই গিয়ে ওঠল তারা।

কিন্তু মামা-বাড়ি এলে কি হয়, সব কিছু নীলুর কাছে কেমন যেন ওলট-পালট ঠেকে।—মামী নামাজ পড়তে বসেছিলেন। নীলু জানে নামাজ পড়তে হয় পশ্চিম দিকে মুখ করে, কিন্তু তার কাছে মনে হল মামী যেন দক্ষিণ দিকে ফিরে নামাজ পড়ছেন!

কি একটা ব্যাপারে আব্বার হাতের ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে সে আরো অবাক হল। আব্বার হাত ঘড়িতে বাজছে চারটে, কিন্তু মামাদের দেয়াল-ঘড়িটা ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজিয়ে দিয়েছে কেন? ঘড়ি কোনটা যে খারাপ হয়েছে জিজ্ঞেস করতে যাবে,

এমন সময় তার আব্বা নিজে থেকেই বললেন ঃ ওহ হো; আমার ঘড়ির সময়টা তো ঠিক করে নিতে হবে; এখানকার ঘড়ি আবার আগে আগে চলে কিনা।

নীলু ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে বসল ঃ তাহলে আসলে এখন কটা বাজে আব্বা, চারটে, না পাঁচটা ? আব্বা এ-কথার পরিষ্কার কোন জবাব দিতে পারলেন না। কেমন একটু আমতা আমতা করে বললেন ঃ আসলে ঠিক সময় বলে তো কিছু নেই; লোকে যা বলে তাই হয়। করাচির লোকেরা বলছে এখন চারটে বাজে, তাই তাদের কাছে এখন বিকেল চারটে। ঢাকার লোক বলছে এখন পাঁচটা বাজে, তাই তাদের ঘড়িতে এখন পাঁচটা।

কিন্তু নীলু বুঝতে পারল ব্যাপারটার মধ্যে কি একটা গোলমাল আছে। নইলে একই সময়ে এক এক জায়গার লোক খামাখা ঘড়িতে নিজেদের খেয়ালখুশি মাফিক এক একটা সময় বাজিয়ে রাখবে কেন? তার আব্বাও কথাটা বলেই বিজ্ঞানের প্রফেসর নিলুর মামার মুখের দিকে তাকালেন।

মামা কি একটা মোটা বই পড়ছিলেন। তার পাতা থেকে ঘার তুলে বললেন ঃ আসলে সময়ের এই তফাতটা নেহাতই কল্পনা বা খেয়ালখুশির ব্যাপার নয়; মানুষ দরকারে পড়েই সময়ের নানা রকম নিয়ম-কানুন বানিয়েছে। যেমন ধর, ইস্কুলে পড়ায় সূর্য মাথার ওপর ওঠে বেলা ঠিক দুপুর হলে ঘড়িতে বারোটা বাজবে; সেইটেই হল আদত ঠিক সময়। কিন্তু দুনিয়াটা গোল বলে এর সব জায়গায় একই সময়ে ঠিক দুপুর হয় না। তাই বারোটাও আর সব জায়গায় একই সময়ে বাজে না। ঢাকায় যে সময়ে সূর্য মাথার ওপরে ওঠে কোলকাতায় ওঠে তার ৮ মিনিট পরে, করাচিতে দেড় ঘণ্টারও বেশি পরে। কাজেই দেখ, সারা দুনিয়ার জন্যে একটাই আসল ঠিক সময় বলে কিছু নেই।

শুধু তাই না। দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা যে গ্রীনিচের মান মন্দিরের ঘড়ি তাতেও সব দিনেই বারোটা বাজবার সময় সূর্য ঠিক আকাশের মাঝামাঝি থাকে না। মোটামুটিভাবে সূর্য মাঝখানে ওঠলে বারোটা বাজে বছরে চার দিন মাত্র! তার মানে দুনিয়ার সব সেরা ঘড়িও আসলে সূর্যের সময় ধরে চলে না, চলে মাঝামাঝি একটা কাল্পনিক সময় ধরে। সূর্যের সময় ওর সাথে গড়পড়তা ভাবে মিলে যায়। তাই একে বলে 'গ্রীনিচের গড় সময়' বা Greenwich Mean Time (G.M.T.) *।

* গ্রীনিচ জায়গাটা লণ্ডনের কাছে। গ্রীনিচের ঘড়িতে যখন ভোর ছ'টা বাংলাদেশে তখন দুপুর বারোটা। বিলেতের ঘড়িগুলো ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে পশ্চিম ইউরোপের সাধারণ সময় ধরে চলে—G.m.T-র এক ঘণ্টা আগে আগে।

ভারতের লোকেরা তাদের কাজের সুবিধের জন্যে সারা দেশের একটা সাধারণ সময় ধরে নিয়েছে। তেমনি বাংলাদেশের আর পাকিস্তানের লোকেরা ধরেছে অন্য রকম সাধারণ সময়। বাংলাদেশের সময় পাকিস্তানের সময়ের চেয়ে এক ঘণ্টা এগিয়ে, আর ভারতের সময় থেকে আধ ঘণ্টা এগিয়ে।

আসলে যুগ যুগ ধরে ঠিকমতো সময় মাপার কায়দা-কানুন নিয়ে মানুষের ভাবনা-চিন্তার অন্ত নেই। আগেকার দিনে কত রকম যে যন্ত্র বানানো হয়েছিল, শুনলে অবাক হতে হয়, কাল ছুটির দিন আছে নীলুকে সে সব কাহিনী শোনানো যাবে।

পরদিন মামা তার কথা রেখেছিলেন। দুপুর বেলা খেয়ে-দেয়ে উঠে নীলুকে তিনি যেসব কাহিনী শুনিয়েছিলেন, তার শুধু দরকারি কথাগুলো লিখে ফেললে এই রকম দাঁড়াবে ঃ

সময় মাপার কাহিনী

আগেকার দিনে—ধর আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে—লোকে এমন সব অদ্ভুত কাণ্ড করে সময় মাপত যা এখন শুনলে আমাদের দস্তুরমতো হাসি পাবে। যেমন, ধর মঠে উপাসনার সময় ঠিক করবার একটা উপায় ছিল, ধর্ম গ্রন্থের পৃষ্ঠা হিসাব করা।—ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যাক।

ধর, তুমি ইতিহাসের বইখানা নিয়ে পড়তে বসেছ। এর প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা পড়তে তোমার মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে। তুমি হয়তো বলতে পার, ১০ পৃষ্ঠা পড়া হলে আমি স্কুলে যাব; কিংবা ৫ পৃষ্ঠা আগে মিনি ডাকতে এসেছিল। ঠিক এমনি করে তখনকার দিনে সন্ধ্যে হলে মাঠের একজন সন্ন্যাসী ধর্মগ্রন্থ নিয়ে পড়তে বসত। তারপর একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত এলেই বোঝা যেত রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—তখন সে উঠে উপাসনার জন্যে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দিত। আর তাই শুনে মঠের আশে-পাশের অন্য লোকেরাও টের পেতো যে, ভোর হয়ে এসেছে।

কিন্তু বুঝতেই পারছ এ-রকম করে সময় মাপা আসলে খুব সুবিধের ব্যাপার নয়। পড়া কারো তাড়াতাড়ি হয়, কেউ পড়ে ধীরে ধীরে। তাছাড়া সন্ন্যাসী বাবাজী একদিন বইয়ের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল তো-ব্যস!

তার চেয়ে বরং দিনের বেলা সাধারণ কাজকর্মের জন্যে সূর্য দেখে সময় বলা অনেক সুবিধে। তাই পাড়াগাঁয়ে—যেখানে ঘড়ি নেই, কিংবা লোকে মিনিট গুনে

সময় হিসাব করার দরকার মনে করে না—সেখানে আজও সূর্য দেখেই সময়ের হিসাব হয়। শহরের লোকেরা যেমন সময়ের চুলচেরা হিসাব করে, গাঁয়ের লোকদের তার দরকার হয় না। তাই তারা সোজাসুজি বলে সকাল বেলা, এক প'র বেলা, দুপর বেলা, বিকেল বেলা, তারপর সন্ধ্যেবেলা, ব্যস! তাদের খাটুনি যেমন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটানা। সময়ের হিসাবও তেমনি নেহাত সাদামাটা।

আগেকার দিনে আজকের মতো শহর ছিল না, অফিস-আদালত, রেলগাড়ি –উড়োজাহাজ, রেডিও-কলকারখানা কিছুই ছিল না। কাজেই তখন সারা দেশের সময়ের হিসাবই চলত আজকের গাঁয়ের হিসাবের মতো। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেশে যত শহর-বন্দর গড়ে উঠতে লাগল, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে লাগল, মানুষের কাছে সময়ের দামও তত বেড়ে উঠল: মানুষ বুঝতে পারল আরো নিখুঁতভাবে সময়ের হিসাব রাখবার ব্যবস্থা করা দরকার।

সূর্যের ছায়া থেকে নিখুঁতভাবে সময় মাপার একটা কায়দা, যাকে বলে সূর্য ঘড়ি, আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রথমে ব্যাবিলনে। আজ থেকে তিন চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলনই ছিল দুনিয়ার মধ্যে সেরা শহর। সূর্য ঘড়ি ব্যাবিলন থেকে যায় গ্রীস দেশে। এই ঘড়িতে একটা চ্যাপটা পাথরের ওপর ঘণ্টার সংখ্যাগুলো লেখা থাকত; তার ওপর খাড়া করে বসানো হত একটা তেকোণা লোহার ফলক। এই ফলকের ছায়াই দাগকাটা পাথরের ওপর ঘড়ির কাঁটার মতো সময় নির্দেশ করত।

সূর্যঘড়ি আজকালও আমাদের দেশে দু-একটা দেখতে পাওয়া যায়।

সূর্য-ঘড়ির একটা মুশকিল হল, এতে শুধু যখন আকাশে সূর্য থাকে তখনই সময় দেখা যায়, কিন্তু আকাশে মেঘ করলে কিংবা রাতের বেলা এটা অচল। তখন সময় মাপার জন্যে করতে হয় অন্য ব্যবস্থা।

একটা ফুটো পাত্রে পানি ভরলে পানিটা ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু যত বার পানি ভরা যাক সবটা পানি বেরিয়ে যেতে প্রত্যেক বার একই সময় লাগে। ঠিক

এমনি তলায় ফুটোওয়ালা লম্বা সরু পাত্রে পানি ভরে তৈরি হল জল-ঘড়ি। সেও আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, এই ব্যাবিলন শহরেই।

পুরনো বইতে মিসর দেশের একটা অদ্ভুত রকমের দুধের ঘড়ির কথা পাওয়া যায়। প্রাচীন মিসরে নীল নদের ওপর একটা দ্বীপে ছিল 'ওসিরিস' দেবতার এক মন্দির। এই মন্দিরে থাকত তলায় ফুটোওয়ালা ৩৬০টা কলস আর প্রত্যেকটা কলসের জন্যে একজন করে সেবায়েত। রোজ ভোরে একজন সেবায়েত তার ঘড়ায় দুধ ভরত, আর ঠিক ২৪ ঘণ্টায় দুধটা যেত তার ফুটো দিয়ে বেরিয়ে। তারপর আর এক পুরোহিত তার ঘড়া ভরত দুধ দিয়ে—এমনি করে চলত সারা বছর।

কিন্তু তার জন্যে মন্দিরে এতগুলো ঘড়া আর সেবায়েত রাখা হয়েছিল কেন সেটা আমাদের কাছে আজও এক রহস্য বলে মনে হয়। এমন হতে পারে যে, মাত্র দু-একটা ঘড়া আর দু-একজন সেবায়েত দিয়েও যে কাজটা চলে যেতে পারে সে বুদ্ধি হয়তো সেকালে ফ্যারাওদের মাথায় খেলে নি। কিংবা হয়তো ঘড়ায় দুধ ভরার জন্যে এতগুলো লোক রাখতে তখনকার রাজরাজড়াদের খুব বেশি খরচ পড়ত না।

সে যাই হোক বিলাসিতা করে দুধ ব্যবহার করা হলেও আসলে তো এর কায়দাটা জল-ঘড়িরই। পানির বদলে বালি ব্যবহার করে বালি-ঘড়িরও চলন হয়েছিল। দু'দিক মোটা মাঝখানটা সরু ফাঁদলের মতো দেখতে তার ভেতর দিয়ে ঝির ঝির করে মিহি বালি পড়ে। চাবি দেবার দরকার নেই, ঘড়িটা শুধু উলটো করে বসিয়ে দিলেই হল।

ধীরে ধীরে জল-ঘড়ির আরো উন্নতি হয়েছিল। যাতে ঘণ্টা মাপা যায় তার জন্যে পাত্রের গায়ে দাগ কাটা হল। দাগ কাটার মধ্যেও অবশ্যি বেশ খানিকটা বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে। পাত্রের পানি আগাগোড়া সমান বেগে বেরোয় না। যখন পানি ভরতি থাকে তখন ওপরের বেশি চাপে পানি বেরোয় তাড়াতাড়ি। কিন্তু পানি কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে চাপও কমে, ফুটো দিয়ে পানিও বেরোতে থাকে ধীরে ধীরে; আর সেই জন্যে দাগ কাটতে হয় ছোট-বড় করে।

কিন্তু মনে রেখো হাজার হাজার বছর ধরে আজকের মতো ঘরে ঘরে এসব ঘড়ির চল হয় নি। যে সব রাজ-রাজড়া, বড়লোকের বাড়িতে জল-ঘড়ি থাকত তাদের আবার ঘড়ির পানি বদলাবার জন্যে আলাদা চাকর রাখতে হত। তাই দেশের বেশির ভাগ সাধারণ লোকই দিনের বেলা সময়ের হিসাব রাখত সূর্যের দিকে তাকিয়ে, আর শেষ রাতে মোরগের ডাক শুনে—ঠিক আমাদের গাঁয়ের লোকেরা যেমন আজও করে।

সে যাই হোক, ব্যাবিলন আর মিসর থেকে জল-ঘড়ি তৈরির কায়দা ক্রমে ক্রমে গ্রীসে, তারপর রোমানদের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

আজ থেকে প্রায় দু হাজার বছর আগে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরের বেশ খ্যাতি হয়েছিল জল-ঘড়ি তৈরির জন্যে। এই শহরেই প্রথম যে সব বুদ্ধিমান লোক ঘড়ি তৈরির কায়দা বার করেছিলেন তাঁদের হাত থেকে বিদ্যেটা কারিগরদের হাতে যায়। কারিগরদের হাতে এসে জল-ঘড়ির আশ্চর্য উন্নতি হয়। এখানে টেসিবিয়স (Ktesibius) নামে এক কারিগর অদ্ভুত কৌশলের সাথে তখন এক রকমের

ঘড়ি বানিয়েছিল; তাতে নাকি কখনো চাবি দিতে হত না বা পানি ভরতে হত না, অথচ শীত-গ্রীষ্মে ঘড়িটা ঠিক সময় দিয়ে যেত।

এইসব ঘড়ি ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে ভূমধ্যসাগরের তীরে তীরে—ইতালীতে, ফ্রান্সে, আরো নানা দেশে। বাগদাদের বিখ্যাত খলিফা হারুনুর রশীদ ৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট শার্ল মানকে এক আজব রকমের জল-ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। এই ঘড়িতে ঘণ্টা বাজত। ঘড়িতে যতটা বাজত ততগুলো তামার বল

রোমান যুগে বক্তার সময় হিসাব করা হত জল-ঘড়ির সাহায্যে

বেরিয়ে এসে ঢং ঢং করে পড়ত নিচে রাখা একটা তামার পাত্রে। তাছাড়া ঘড়িতে ছিল বারোটা দরজা; প্রত্যেক ঘণ্টায় একটা করে দরজা খুলে যেত। দুপুর বারোটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে বারোটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসত বারোজন ঘোড়সওয়ার। ঘড়ির চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে তারা দরজাগুলো একে একে বন্ধ করে দিত। এই ঘড়িতে নাকি এমনি আরো নানা আশ্চর্য ব্যাপার হত।

ফ্রান্সের লোকেরা এই ঘড়ি দেখে দারুণ অবাক হয়ে যায়। সে সময়ে ইউরোপের পণ্ডিতরা ধর্মতত্ত্ব, ব্যাকরণ এইসব বিষয় নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। তখনও ফ্রান্সের বেশির ভাগ গীর্জাতেই ঘণ্টা বাজানো হত সূর্য দেখে; রাতে বড়জোর মোমবাতি বা প্রদীপের তেল পোড়ার হিসাব থেকে।

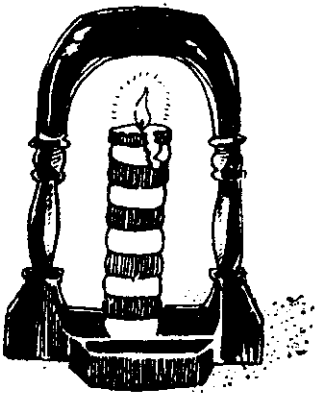

মোমবাতি ঘড়ি

ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিতরা কিন্তু সেই তখন থেকেই মাথা ঘামাচ্ছেন ঘণ্টাকে কি করে আরো ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা যায় সেই সব কঠিন কঠিন আঁক-জোখ নিয়ে। এক মস্ত বড় পণ্ডিত ঘণ্টাকে ভাগ করার বুদ্ধি

বাতলালেন এই বলে ঃ এক ঘণ্টা সমান চার কোয়াটার বা চার মুহূর্ত, চারশো আশি 'আউন্স' (?) বা পাঁচ হাজার ছ'শো চল্লিশ মিনিট!

মজার ব্যাপার হচ্ছে কাজের বেলা এই সব ভাগ কি করে মাপা যাবে তা নিয়ে তাঁদের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না; কাগজে-কলমে ভাগ করে দিয়েই তাঁরা খালাস। এর আরো অনেক পরে যখন পেণ্ডুলামওয়ালা ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে তখনই কেবল আদতে ঘণ্টাকে মিনিটে, আর মিনিটকে সেকেণ্ডে ভাগ করা গিয়েছে, তার আগে নয়।

দুধ-ভাত খাওয়া ঘড়ি

খুব ছোট বেলায় আব্বার টেবিলের ওপর টাইম-পিস ঘড়িটা দেখে আমি ভাবতাম ওটা বুঝি জ্যান্ত, কেমন টিক টিক করে কথা কয়। মা-কে যদি জিজ্ঞেস করতাম, আচ্ছা মা, ঘড়িটা কি খেয়ে থাকে—তাহলে মা রহস্য করে জবাব দিতেন ঃ কী আবার খাবে; ওটা দুধ-ভাত খায়!

তারপর বড় হয়ে ঘড়িকে খুলতে দেখেছি, নিজে খুলেছি। ওর ভেতর কত যন্ত্রপাতি, যেন একটা দস্তুরমতো কারখানা চলছে, কতো কি ধারকাটা চাকা সব ঘুরছে, সব শামুকের মতো ধীরে ধীরে—মিনিটের আর সেকেণ্ডের দুটো কাঁটাকে শুধু ঘোরাবার জন্যে। কিন্তু সব কল-কবজা চলার জন্যেই তো শক্তির দরকার। রেল গাড়ি বা জাহাজ চলে কয়লা আর পানিতে অথবা তেলে; মানুষ চলে নানান রকম খাবার খেয়ে। কিন্তু ঘড়ি আসলে দুধ-ভাতও খায় না বা ওতে পানিও ভরতে হয় না। তাহলে ঘড়ি চলে কি করে?

ওলন দেখেছ তো? সেই যে রাজমিস্ত্রীরা ইট সাজাবার সময় ছোট পেতলের লাট্টুর মতো জিনিসের সাথে সুতো বেঁধে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে দেখে গাঁথুনি সোজা হচ্ছে কিনা। প্রথম দিকে কাঁটাওয়ালা ঘড়ির যখন আবিষ্কার হয়, তখন তার কাঁটা ঘোরাবার জন্যে একটা কাঠিমের গায়ে সুতো পেঁচিয়ে এমনি ওলন ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। ভারি ওলনটা নিজের ওজনেই ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে আসতো; সেই টানে কাঠিমটা ঘুরতো, আর তার সাথে সাথে ঘুরতো ঘড়ির কাঁটাও।

এই রকম ওলনদার ঘড়ি প্রথম কে বা কারা আবিষ্কার করেছিলেন আজ আর তা ঠিকমতো বলার উপায় নেই; তবে এগুলো যে ইউরোপে গিয়েছিল আরব দেশ

থেকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজ থেকে হাজার খানেক বছর আগে আরবের লোকেরা ইউরোপের লোকের চেয়ে শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেকখানি এগিয়ে ছিল।

যতদূর জানা যায়, আজ থেকে প্রায় সাতশো বছর আগে সুলতান সালাহউদ্দিন তাঁর বন্ধু বিলেতের সম্রাটের কাছে খুব সুন্দর একটা ওলনদার ঘড়ি উপহার পাঠিয়েছিলেন। তারও পঞ্চাশ বছর পরে সম্রাট প্রথম এডওয়ার্ডের হুকুমে লণ্ডনের পার্লামেন্ট ঘরের ওপরে ওয়েস্টমিনস্টারের চূড়োয় একটা মস্ত বড় ঘড়ি বসানো হয়; তার নাম দেওয়া হয় 'বিগ টম'।

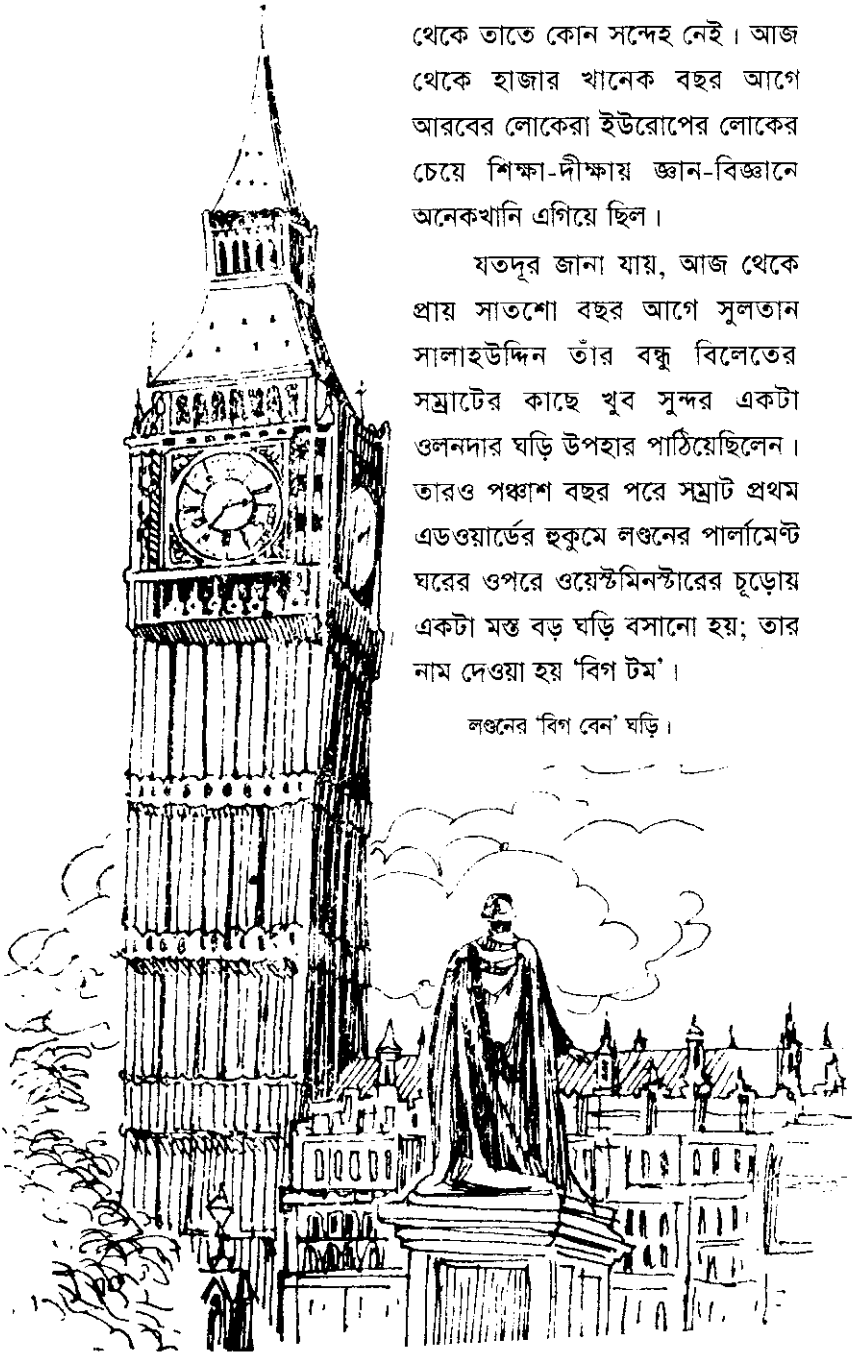

লণ্ডনের 'বিগ বেন' ঘড়ি।

ওয়েস্টমিনস্টারের বিরাট উঁচু চূড়ো; তিনশো ষাটটা ধাপ ভেঙ্গে তবে তার ওপরে উঠতে হতো। পুরো চারশো বছর ধরে বিগ টম ঘড়িটা ওখান থেকে ঘণ্টা বাজিয়েছে, আর সারা লণ্ডন শহরের লোক তাই থেকে সময়ের হিসাব ঠিক রেখেছে। তার পরে ওটাকে সরিয়ে সেখানে 'বিগ বেন' নামে আরো বড় একটা ঘড়ি বসানো হয়েছে।

ইউরোপের আর আর বড় শহরেও এমনি চূড়োর ওপর ঘড়ি বসানো শুরু হয়েছে। ফ্রান্সের সম্রাট চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জার্মানি থেকে একজন খুব নামজাদা ঘড়ি কারিগরকে ডেকে পাঠালেন; তার প্রাসাদের চূড়োয় একটা ঘড়ি বসাতে হবে। আট বছর খেটেখুটে ঘড়ি তৈরি হল। তারপর সেই কারিগরকে —নাম তার হেনরি ডি-ভিক—ঘর দিয়ে, মাইনে দিয়ে সেই ঘড়ির চূড়োতে রেখে দেওয়া হল। তার কারণ তখনকার দিনে এসব ঘড়িতে দিনের মধ্যে কয়েক বার চাবি দিয়ে কাঠিমের ওপর ওলনের সুতোটা জড়াতে হত, আর তাই তার দেখাশোনা করবার জন্যে হরদম ঘড়ির সাথে লোকও রাখতে হত একজন।

আজকালকার চেয়ে আগেকার দিনের ঘড়িগুলো আসলেই ছিল একটু বেয়ারা রকমের জবড়জঙ্গ গোছের। কাঁটা মোটে একটা, শুধু ঘণ্টার কাঁটা; মিনিটের কাঁটা বলে কিছুই নেই। কিন্তু কী বিরাট সে ঘড়ির ওলন, বিরাট বিরাট তার কল -কবজা-দেখলেই ভয় পাবার কথা।

আমাদের ঘড়িতে আজকাল এক থেকে বারোটা পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে। কিন্তু আজকাল রেলের ঘড়িতে যে রকম হিসাব, তখনকার ঘড়িতে ডায়ালটা ওই রকম ২৪ ভাগে ভাগ করা থাকত! তারপর তখন ঘড়িতে দিনের শুরু ধরা সন্ধ্যেবেলা থেকে। অর্থাৎ সন্ধ্যের পরে একটা বাজত, তারপর আবার পরের দিন সন্ধ্যেবেলা বাজত ২৪টা। কিন্তু সাধারণ কাজের জন্যে ও-রকম হিসাবে নানান হ্যাঙ্গামা। বিকেল পাঁচটায় বেড়াতে বেরুব না বলে যদি ২৩ টা বলতে হয়, তাহলে কেমন শোনায়? ছোট সংখ্যা নিয়ে হিসাব করাই লোকের পক্ষে সুবিধে। তাই ক্রমে ক্রমে ২৪ ঘণ্টার বদলে ঘড়ির দাগকে ১২ ঘণ্টায় ভাগ করার ব্যবস্থা হয়; আর দিনের শুরু ধরা হয় সন্ধ্যেবেলার বদলে দুপুর রাতের পর থেকে।

আসলে কিন্তু লোকে জবড়জঙ্গ জিনিস মোটেই পছন্দ করে না; সহজ জিনিসের দিকেই তাদের ঝোঁক। তাই প্রথম দিককার চূড়োর সেই দশ-পনের মণ ওজনের বিরাট বিরাট ঘড়িগুলো থেকে ছোট ঘড়ি তৈরির চেষ্টা চলতে লাগল। কম দামের

মধ্যে ছোট ছোট ঘড়ি না হলে সাধারণ লোকে তা ব্যবহারই বা করবে কি করে, আর তাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নাড়াচাড়াই বা করা যাবে কি করে? এসব চেষ্টার ফলে ক্রমে ক্রমে ঘড়ি ছোট হয়ে আজকের দেয়াল-ঘড়ি, টাইম-পিস আর হাত ঘড়ি তৈরি হয়েছে।

নাড়াচাড়া করা যায় এ-রকম একটা ঘড়ি তৈরি করা হয়, ফ্রান্সের সম্রাট ষোড়শ লুই-এর হুকুমে। তাই বলে এটাকেও যেখানে সেখানে ইচ্ছেমতো হাতে করে বয়ে নেয়া চলত না। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে হলে তাকে বাক্সবন্দী করে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হত।

তারপর ১৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে প্রথম পকেট-ঘড়ি তৈরি হয়; তৈরি করেন জার্মানির নুরেমবুর্গ শহরের পিটার হেনলীন (Peter Henlein) নামে এক কারিগর। লোকে বলে হেনলীনের ছিল বেজায় বুদ্ধি। এমন খুদে একটা ঘড়ি বানাবার জন্যে কম বুদ্ধি তো আর খরচ করতে হয় নি তাঁকে; বড় বড় ঘড়ির ওলন আর ওজন-টোজন সব বাতিল করে দিয়ে এবার ঘড়িকে চালাবার জন্যে ব্যবহার করা হল স্প্রিং।

একটা লম্বা স্প্রিং-কে যতই পেঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা যাক না কেন সেটা সুযোগ পেলেই সে প্যাঁচ খুলে ফেলার চেষ্টা করবে। এই স্প্রিং দিয়ে চালানো হল ঘড়ি। ঘড়িতে চাবি দিয়ে স্প্রিং-কে যত প্যাঁচ ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে, খোলার সময় আবার ততগুলো প্যাঁচই খুলে আসবে। কিন্তু স্প্রিং-কে তার ইচ্ছেমতো খুলতে দিলে হবে না, তাহলে এক সঙ্গেই সবটা খুলে যাবে। তাই এই স্প্রিং-এর সঙ্গে লাগানো হল গায়ে গায়ে ঠেকানো কতগুলো ধারকাটা চাকা, তারপর তার সাথে যোগ করা হল ঘড়ির কাঁটা। এই সবের ফলে নির্দিষ্ট হারে স্প্রিং-এর প্যাঁচ খুলবে, ঘুরবে ধারকাটা চাকাগুলো; আর তার সাথে ঘুরবে ঘড়ির কাঁটা দুটো।

প্রথম প্রথম যখন এমনি স্প্রিং-ওয়ালা ছোট ঘড়ি বের হল তখন ঘড়ির বাজারে রকম-বেরকম ফ্যাশনের স্রোত বইতে লাগল। প্রথম দিককার কতকগুলো ঘড়ি তৈরি হয়েছিল ডিমের মতো আকারের, তাদের নাম দেওয়া হল 'নুরেমবুর্গের ডিম'। তারপর ক্রমে ক্রমে বেরুতে লাগল প্রজাপতি বা ফুলের মতো ঘড়ি; নানা রকম লতা-পাতা-আঁকা, দামী দামী পাথর বসানো রকম-বেরকমের ঘড়ি।

এত সুন্দর আর বাহারে জিনিস পকেটে পুরে রেখে কি আর মনের শখ মেটে; শৌখিন লোকেরা তাই এ-সব ঘড়ি লোককে দেখাবার জন্যে মেডেলের মতো গলায়

বা বুকের ওপর ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ক্রমে ক্রমে ঘড়ির কারিগররা ছোট ঘড়ি বানাতে এমন ওস্তাদ হয়ে ওঠে যে তারা কানের দুলে বা হাতের আংটিতে বসানো যায় এরকম ঘড়ি বানাতে শুরু করে। এসব সূক্ষ্ম কাজে তাদের নিপুণতা দেখে আজও আমাদের অবাক হতে হয়।

আজকাল যেমন ঘড়ির সব অংশ কারখানায় ছাঁচে তৈরি হয়, তারপর কারিগররা সেগুলোকে শুধু একসাথে জুড়ে দেয়, আগেকার দিনে মোটেই সে-রকম ছিল না। তখন প্রত্যেকটা অংশই হাত দিয়ে বানাতে হত। কাজেই ঘড়ি আজ যেমন সস্তা হয়েছে, তখন মোটেই সে-রকম ছিল না। আর তাই সেকালে বড় বড় নবাব-জমিদার রাজ-রাজড়া ছাড়া আর কারো ঘড়ি কিনার সাধ্য হত না। অবশ্য রাজ-রাজড়ারা খুশি হয়ে কাউকে কাউকে ঘড়ি উপহার দিতেন।

ঘড়ির কাহিনী বলতে গিয়ে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে আবার একটু ফিরে যাওয়া যাক। বলেছিলাম নানা রকম ভাবে সময় মাপা যায়; যাতে নির্দিষ্ট হারে সময় লাগে—যেমন বই পড়তে পাতা গুনে, কিংবা বাতির তেল কতটা ফুরলো তাই দেখে আগে সময় মাপার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু তাবলে নিখুঁতভাবে সময় মাপবার জন্যে যেমন-তেমন সব রকম হিসাবের ওপর তো আর নির্ভর করা চলে না। যেমন ধর, কামারশালায় হাতুড়ি পেটাতে মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট হারে সময় লাগে; তাই বলে সময় মাপার জন্যে কেউ কি আর একটা হাতুড়ি পিটে যেতে পারবে? আর তাছাড়া হাতুড়ি পেটার সময় যে ঠিক একেই হারে হবে, তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই।

এইসব অসুবিধের কথা ঘড়ি তৈরি করতে গিয়ে মানুষ বহুদিন ধরেই ভাবছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ দেখেছে একদিন সকালে সূর্য ওঠা থেকে পরদিন সূর্য ওঠা পর্যন্ত সময়টা মোটামুটি স্থির। কাজেই সেই সময়কে সমান ২৪ ভাগ করে সূর্য-ঘড়ি তৈরি হল। কিন্তু তারও অনেক অসুবিধে।

পকেট-ঘড়ির নাম 'নুরেমবুর্গের ডিম'।

জল-ঘড়িতে পাত্র থেকে সমান পরিমাণ পানি বেরিয়ে যেতে বার বার একই সময় লাগে; কিন্তু একটু ময়লা-টয়লা লেগে তলার ফুটোটা আটকে গেলেই সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল। তাছাড়া সবচেয়ে ভাল যে জল-ঘড়ি তাতেও কেবল ঘণ্টার হিসাবই মাপা যেত, মিনিটের কোন কথা ছিল না। তারপর তৈরি হল কিছুটা উন্নত ধরনের ওলনদার ঘড়ি। কিন্তু এ ঘড়িও নিখুঁতভাবে সময় দিতে পারত না; তাকে সব সময় আকাশের সূর্যের সাথে মিলিয়ে ঠিক করে রাখতে হত। আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে একটি ছেলে ঠিক এই কথা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছিল ঃ কোন জিনিস নির্দিষ্ট হারে সময় দেয়। তার নাম হল গালিলিও গালিলাই (Galileo Galilei)। গালিলিও আজ সারা দুনিয়ায় একজন সেরা বিজ্ঞানী বলে পরিচিত। কিন্তু সূর্যের চারধারে পৃথিবী ঘুরছে, এই সত্যি কথাটা বলার অপরাধে সেদিন সেই অন্ধযুগের লোকেরা তাকে প্রায় পুড়িয়ে মারবার যোগাড় করেছিল।

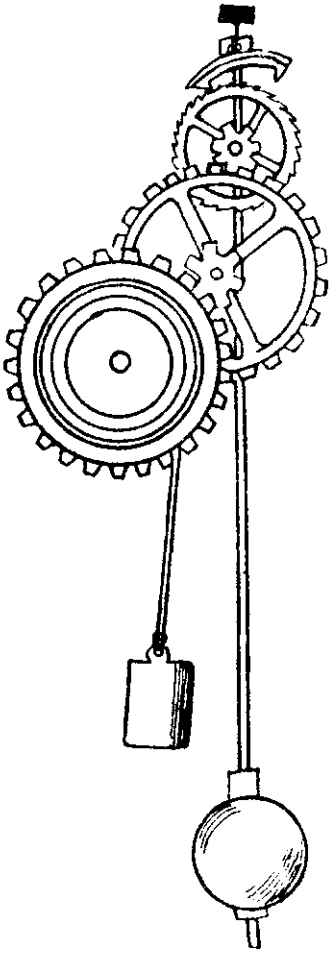

পেণ্ডুলাম ঘড়ির কলকব্জাঃ সামনা-সামনি দেখলে।

ছোট বেলায় গালিলিও একদিন গীর্জায় গিয়েছেন; মাথার ওপর একটা ঝাড়বাতিকে অনবরত দুলতে দেখে তাঁর মাথায় হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল। তাঁর মনে হল প্রত্যেক দোলায় ঝাড়বাতিটার যেন একই রকম সময় লাগছে। তারপর তিনি অনেক পরীক্ষা করে দেখলেন, একটা সুতোর আগায় পাথর বা এমনি ভারি কিছু বেঁধে দোলালে তার

প্রত্যেকটা দোলায় সব সময় ঠিক একই সময় নেয়। এই সময় অবশ্য নির্ভর করে সুতো কতখানি লম্বা তার ওপরে—সুতো কমালে-বাড়ালে সময়ও সেইভাবে কমে-বাড়ে। সুতো বা সরু দণ্ডের আগাই ভারি কিছু বাঁধা এই ব্যবস্থাটার নাম হল পেণ্ডুলাম বা দোলক। এমনি করে গালিলিও এত দিনকার একটা মস্ত বড় সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। কিন্তু তিনি একে ঘড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করতে পারেন নি; পেণ্ডুলাম দিয়ে ঘড়ি বানালেন আর একজন বিজ্ঞানী, নাম তার ক্রিস্টোফার হয়গেনস। তার ফলে ঘড়ি দিয়ে সময় মাপা আগের চাইতে অনেকখানি নিখুঁত হয়ে এলো। আগেকার ঘড়িতে ছিল শুধু ঘণ্টার কাঁটা; এবার তার সাথে যোগ করা হল মিনিটের কাঁটা, তারপর সেকেণ্ডের কাঁটা।

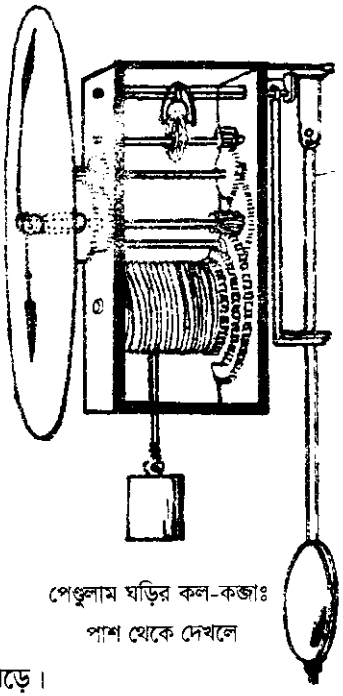

পেণ্ডুলাম ঘড়ির কল-কব্জাঃ পাশ থেকে দেখলে

ঘড়ির উন্নতি কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। দিন দিনই ঘড়ির আরো উন্নতি হচ্ছে, ঘড়ির দামও তেমনি কমছে, আর সাধারণ লোকদের কাছেও ঘড়ি পৌঁছচ্ছে। সব আবিষ্কারের বেলাতেই এমনি হয়। প্রথম প্রথম জিনিসটা থাকে নতুন; অল্প গুটিকয়েক লোক তার কথা জানে, আরো অল্প লোক তাকে ব্যবহার করতে পারে। তার পরেও বিজ্ঞানীদের গবেষণা চলতে থাকে, আরো তার উন্নতি হয়, সমাজের সব রকম লোকের মধ্যে তার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে।

সেকালে আজকের মতো বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয় নি, এত নানা রকমের কল-কবজার আবিষ্কারও হয় নি। বলতে গেলে, ঘড়ির কারিগররাই এই সব কল-কবজার আবিষ্কারের পথ দেখিয়ে ছিলেন। সেকালে যাঁরা বড় বড় আবিষ্কার করেছেন তারা সবাই ছিলেন ঘড়ির কারিগর; যেমন বিলেতের আর্করাইট, হারগ্রীভ্‌স্ ফুলটন—এঁদের নাম হয়তো তোমরা শুনেছ। সুতো বোনার কল, কাপড়ের কল আর কলের জাহাজ আবিষ্কার করে এরা মানুষের জীবনযাত্রায়

যুগান্তর এনেছেন। এই সব কল-কবজা বানাবার জন্যে তাঁরা ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যে শেখেন নি। ঘড়ির কারখানায় হাতে-কলমে কাজ করতে করতেই তাঁদের সে শিক্ষা হয়েছে।

বিলেতে এই সব আবিষ্কার হবার পর সারা দেশ জুড়ে বিরাট বিরাট সব কল-কারখানা গড়ে ওঠতে লাগল। গাঁয়ের চাষীরা দল বেঁধে কাজের খোঁজে ছুটল শহরের দিকে; রাতারাতি আশে-পাশের সব কিছু যেন বদলে যেতে লাগল। আঠারো শতক ইতিহাসের দিক থেকে খুব দূরের কথা নয়। কিন্তু গেল এই দুশো বছরে বিজ্ঞান আর কল-কবজার সাহায্যে মানুষের জীবনে যা পরিবর্তন ঘটেছে তার আগের দুহাজার বছরেও তা হয় নি। এ-সবই হয়েছে যন্ত্রের আবিষ্কার থেকে; আর আসলে তার গোড়ায় রয়েছেন ঘড়ির কারিগররা।

সে সময়ের ঘড়ির কারিগররা শুধু যে দরকারি যন্ত্রপাতিই বানিয়েছিলেন তা নয়। তখনকার হাওয়া ছিল যন্ত্রের নেশায় ভরপুর। কারিগরদের নানা রকম যন্ত্র বানাবার এমন ঝোঁক চেপেছিল যে অদ্ভুত বুদ্ধি খাটিয়ে তারা বহু ধরনের আজব জিনিস বানাতে শুরু করে দেন। তার একটা হল 'কলের মানুষ'। কয়েক জন কারিগর এমন কলের খেলনা বানিয়ে ফেলেন যা মানুষের মতো গান গায়, বাঁশি বাজায়, লেখে, কাজ করে।

তারপর তৈরি হল কলের ক্যালেনডার। এই ক্যালেনডারে বছর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাহের দিনগুলো আপনা আপনি পালটে যায়, ক্যালেন্ডার বদলাবার আর দরকার হয় না। জার্মানির স্ট্রাসবুর্গ শহরের বড় গীর্জাতে ঘড়ির সাথে এই রকম ক্যালেনডার রয়েছে—সারা বছরের কোন্ তারিখ কি বার সেটা এর ডায়ালের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। প্রত্যেক বছর এই ক্যালেনডারের দিন-তারিখ আপনা থেকেই বদলায়।

বিলেতের পার্লামেন্ট ভবনের চূড়োয় বসানো 'বিগ বেন' ঘড়ির কথা একবার বলেছি। 'বিগ বেন' ঘড়ির রাজ্যে এক আশ্চর্য। কত বড় এই ঘড়ি, শুনবে? এর মোট ওজন ৫ টন, অর্থাৎ প্রায় ১৪০ মণ। চূড়োর চার দিকে এর চারটে মুখ, প্রত্যেকটা মুখ চওড়ায় ২৩ ফুট করে। মিনিটের কাঁটাটা লম্বায় ১৪ ফুট (চার মিটারের বেশি); সারা বছরে তাকে একশো মাইল পথ চলতে হয়। দুটো মিনিটের দাগের মধ্যে তফাত হচ্ছে এক বর্গফুট, আর ঘণ্টার সংখ্যাগুলো উঁচুতে দু'ফুট করে।

এই দানব ঘড়ি 'বিগ বেন'-ই শুধু নয়, আমাদের ছোট ছোট হাত-ঘড়িগুলোও কিছু কম আশ্চর্য নয়। ওই ছোট খোলসটার মধ্যে অত সূক্ষ্মযন্ত্রপাতি কি করে পোরা হয়েছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। দেয়াল-ঘড়ির সময় ঠিক রাখা হয় দোলক বা পেণ্ডুলাম দিয়ে। কিন্তু হাতঘড়ি তো আর এমনি করে সব সময় এক অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা যায় না, ওতে তাই দোলক ব্যবহার করার উপায় নেই। তাহলে হাতঘড়ির সময় ঠিক রাখা হয় কি করে?—চুলের মতো সরু তারের স্প্রিং দিয়ে। এই স্প্রিং ব্যালান্স হুইল নামে একটা চাকাকে দোলায়; দেয়াল-ঘড়িতে পেণ্ডুলামের দোলানি যেমন বরাবর ঠিক সময় দেয়, স্প্রিং-এর কাঁপুনির হারও তেমনি সব সময় একই থাকে। যে হয়গেনস দেয়াল-ঘড়ির জন্যে প্রথম পেণ্ডুলাম ব্যবহার করেছিলেন, তিনিই পকেট ঘড়ি চালাবার জন্যে প্রথম স্প্রিং দিয়ে দোলানো ব্যালান্স হুইল ব্যবহার করেন।

যন্ত্রপাতি যত ভালই হোক, মাঝে মাঝে বিগড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। ঘড়িও যে মাঝে মাঝে খারাপ হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? ঘড়ি ভালভাবে চলবার জন্যে ওর ভেতরকার যন্ত্রপাতি বিশেষভাবে তৈরি জলপাই-এর তেল বা আরো ভাল কোন তেলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু বাতাস লাগতে লাগতে এই তেল ঘন হয়ে খারাপ হয়ে যায়। সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলো গায়ে গায়ে ঘষা লেগে আর ভাল চলতে পারে না।

ধুলো-ময়লা, পানি বা ঝাঁকুনিতেও ঘড়ির খুব ক্ষতি করে। কিংবা ঘড়ির কোন স্প্রিং যদি ছিঁড়ে যায় তাহলেও তার টিক্ টিক্ শব্দ যায় থেমে। তখন তাকে ঘড়ির কারিগরের কাছে দেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। তবে সাবধানে ব্যবহার করলে ঘড়ি ঘন ঘন মেরামতের দরকার হয় না।

সব চাইতে নিখুঁতভাবে সময়ের হিসাব দরকার জাহাজ চালাবার জন্যে। গোড়াতেই বলেছি, দুনিয়ার এক এক জায়গায় সূর্যের সময় এক এক রকম। অথচ সমুদ্রে জাহাজ ঠিক কোন জায়গায় আছে সেটা নিখুঁত ঘড়ি আর সূর্য বা তারা দেখে বুঝতে পারা যায়। কিন্তু মুশকিল হল, জাহাজে সাধারণ ঘড়িকে কিছুতেই ঠিক রাখা যায় না—সমুদ্রের অনবরত ঝাঁকুনিতে ঘড়ি ফাস্ট কি স্লো হয়ে যায়। আর ঘড়ি সামান্য বেঠিক হলেও দিক ভুল হবার ভয় পদে পদে।

সেই জন্যে জাহাজের উপযোগী একটা নিখুঁত ঘড়ি তৈরি করে দেবার জন্যে ১৭১৪ সালে বিলেতের পার্লামেন্ট দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেন। সারা দুনিয়ার ঘড়ির কারিগরদের বহু বছরের চেষ্টার পর জন হ্যারিসন নামে এক ইংরেজ

কারিগর আর ফরাসি কারিগর লে'রয় ক্রনোমিটার নামে বিশেষ ধরনের নিখুঁত ঘড়ি তৈরি করেন। কিন্তু এসব 'ক্রনোমিটার' ঠিক সময় দিলে কি হবে, তার কল-কবজা আবার এত সূক্ষ্ম যে আবহাওয়া সামান্য বদলালে, ঠাণ্ডা কিংবা গরমে এর সময়ের এদিক-ওদিক হয়ে যেতে পারে। তাই জাহাজে ক্রনোমিটারকে রাখতে হয় বায়ুশূন্য কাচের পাত্রের মধ্যে।

আজকাল অবশ্য বেতার যোগাযোগের ব্যবস্থা হওয়ায় সারা নিয়া জুড়ে—এমন কি, জাহাজেও—ঠিক সময় রাখা অনেক সহজ হয়ে এসেছে। গ্রীনিচের এবং অন্যান্য জায়গার বড় বড় মান-মন্দিরে আকাশের তারার চলাচলের সাথে সব চাইতে নিখুঁত ঘড়ির সময় মিলিয়ে রাখা হয়। তারপর রোজই সেই সময় রেডিও মারফত ঘোষণা করা হয়; আর নিমেষের মধ্যে দুনিয়ার সব লোক তা জানতে পারে—রেডিওর সাথে মিলিয়ে নিজেদের ঘড়ি ঠিক করে নেয়।

মামা যখন ঘড়ির কাহিনী শেষ করলেন তখন বেশ রাত হয়েছে, নীলুর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। মামার বলার পরও নীলু শুনতে পেল টেবিল ঘড়িটা যেন বলে চলেছে ঃ টিক্ টিক্.....টিক্ টিক্.....টিক্ টিক্.....

হা ড়
কাঁ পা নো
শী তে

জামীল আর রুবা। ভাই আর বোন। বয়সের তফাত ওদের মোটেই এক বছর। জামীল ছয়, রুবা পাঁচ। তাই দিনরাত খেলাধুলো সব এক সাথে। কখনো সে খেলা গরু নিয়ে—হোক না খেলনা গরু অথবা জ্যান্ত বাচ্চা গরু। কখনো হাঁড়ি-কুড়ি বা পুতুল নিয়ে। আবার কখনো বা খেলছে তারা ব্যাট আর বল নিয়ে।

কিন্তু গোল বাধে ওদের রাতে শুতে গিয়ে। রুবা কাঁদবে ঃ আব্বা, ভাই সবটা লেপ টেনে নিয়েছে। জামীল চেঁচাবে ঃ আম্মা, রুবা আমাকে চিমটি কেটেছে। লেপ যে কার ভাগে ঠিক কতখানি থাকবে, সে প্রশ্নের আর কিছুতেই মীমাংসা হয় না।

অথচ সকাল বেলা উঠলে দেখা যাবে জামীল একপাশে পড়ে আছে হাত-পা দুমড়ে গোল হয়ে, রুবা আরেক পাশে গুটি-সুটি হয়ে শুয়ে আছে; মাঝখান থেকে লেপ যে কোথায়, তার কোন পাত্তা নেই। হয়তো বিছানাতেই নেই সে লেপ। কোন ফাঁকে নিচে মেঝেয় পড়ে গেছে।

তোমাদের বাড়িতে কি কখনো এমন হয়? বাচ্চা বা জোয়ান বা বুড়ো ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে গোল হয়ে আছে, এমন দৃশ্য কি দেখেছ কখনো? বাড়িতে অথবা রাস্তার ধারে? মানুষ কিংবা অন্তত কুকুর বা বেড়াল?

আচ্ছা, বলতে পার ঠাণ্ডা পেলে মানুষ এমন কুঁকড়ে গোল হয়ে যায় কেন? হয়তো কেউ কেউ পারবে বলতে। কিন্তু অনেকেই পারবে না।—আচ্ছা, শোন ব্যাপারটা।

আমাদের শরীরের মধ্যে অনবরতই তাপ তৈরি হচ্ছে। আমরা যে সব খাবার দাবার খাই তা থেকেই তৈরি হয় এই তাপ। কিন্তু বাইরে ঠাণ্ডা থাকলে তা এই তাপকে টেনে নেয়। এভাবে তাপ হারানো নির্ভর করে অনেকটা শরীরের গড়ন বা আকারের ওপরে। তার কারণ একই পরিমাণ জিনিস বিভিন্ন আকারের হলে তার ওপরকার আয়তন কম-বেশি হয়।

গোলমতো জিনিসের চেয়ে লম্বা, সরু বা পাতলা জিনিসের আয়তন বেশি। যেমন ধর, এক দলা ময়দা নিলে; তার ওপরকার আয়তন কতটাই বা। কিন্তু সেটাকে বেলে রুটি বানালে তার ওপরকার আয়তন যায় অনেক বেড়ে। ওপরকার আয়তন যত বেশি হবে, শরীর থেকে তাপও হারাবে তত বেশি। এবার তো বুঝলে, হাড় কাঁপানো শীতে শরীরের তাপ ধরে রাখার জন্যে মানুষ বা জন্তু-জানোয়ার কেন কুঁকড়ে গোল হয়ে থাকে?

এরই জন্যে খুব শীতের দেশ আর গরমের দেশের জীবজন্তুর চেহারার মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। যেমন ধর, খরগোশের কান খুব লম্বা বলেই আমরা জানি। খরগোশের নামও হয়েছে এই জন্যেই। ফারসিতে 'খর' মানে বড়, আর 'গোশ' হল কান। কিন্তু এমন লম্বা পাতলা কান যদি বেরিয়ে থাকে খুব শীতের দেশে, তাহলে তাপ হারিয়ে সে কান জমে বরফ হয়ে যাবে। তাই খুব উত্তরে ঠাণ্ডা মেরুর দেশে খরগোশের কান হয় ছোট আর পুরু—যাতে কান থেকে তাড়াতাড়ি তাপ বেরিয়ে যেতে না পারে।

শীতের দেশের শেয়ালের কানও গরমের দেশের শেয়ালের কানের তুলনায় ছোট। অথচ মরুভূমিতে যে সব শেয়াল থাকে তাদের কান আবার লম্বা; তাতে তাদের শরীরের বাড়তি তাপ বেরিয়ে যেতে সুবিধে হয়।

আকার বা গড়ন ছাড়াও কোন জিনিস বড় বা ছোট তার ওপরেও তাপ হারানো অনেকটা নির্ভর করে। বড় জিনিসের মধ্যে তাপ থাকবে বেশি, ছোট জিনিসে কম। তাই বড় জিনিসের তাপ হারাতে সময়ও বেশি লাগবে।

মনে কর গরম দুধের হাঁড়ি থেকে খানিকটা দুধ ঢালা হল একটা চায়ের পেয়ালাতে। পেয়ালার দুধ আগে ঠাণ্ডা হবে, না হাঁড়ির দুধ? তোমরা নিশ্চয়ই বলবেঃ

কেন? পেয়ালা ছোট, তাতে দুধ কম—সেই দুধ তো আগে ঠাণ্ডা হবে। এই জন্যে একই জন্তু সাধারণত গরম দেশের চেয়ে শীতের দেশে বড় আকারের হয়। গরম দেশে যে সব ভালুক দেখা যায়, তাদের চাইতে মেরু অঞ্চলের ভালুক আকারে সচরাচর অনেক বড় হয়। মেরু দেশের ভালুকের কখনো কখনো বিশ মণ পর্যন্ত ওজন হয়।

শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ঠাণ্ডার দেশের জীবজন্তুর চামড়ার তলায় থাকে খুব পুরু চর্বির স্তর। এই চর্বি ঠাণ্ডাকে ঠেকিয়ে রাখে। চর্বি পুড়ে দেহে তাপও সৃষ্টি হয়।

শীতকালে আমরা রাতে যে তুলোর লেপ গায়ে দিই, বলতে পারো তাতে শরীর গরম থাকে কি করে? তুলোর ফাঁকে ফাঁকে আটকে থাকে হাওয়া। আর এই হাওয়ার মধ্যে দিয়ে তাপ সহজে পালিয়ে যেতে পারে না। তাই লেপের আবরণ শরীরের তাপকে বন্দী করে রাখে। কাঁথা কিন্তু তুলোর মতো অতটা হাওয়া আটকে রাখতে পারে না। তাই কাঁথা দিয়ে লেপের মতো অত ভালো করে শীতও ঠেকানো যায় না।

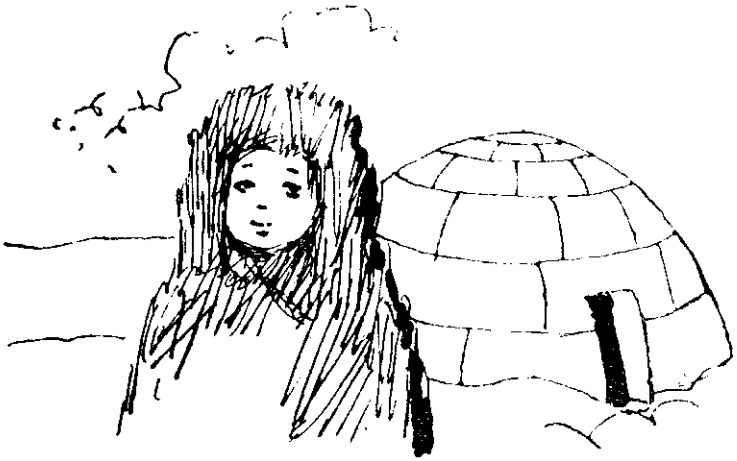

এস্কিমোদের ছবিতে দেখবে, তাদের পোশাক খুব ঢোলা রকমের। অর্থাৎ এমন করে তৈরি যাতে তার মধ্যে অনেকখানি হাওয়া আটকে রাখা যায়— তাহলেই শরীরের তাপ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারবে না।

থারমস ফ্লাস্‌কে যে গরম দুধ, চা ইত্যাদি রাখা হয়, তাতেও কিন্তু অনেকটা একই কৌশল। ফ্লাস্‌কের মধ্যে আছে একটা কাচের বোতল। বোতলের কিন্তু দেয়াল দুটো, আর দুই দেয়ালের মাঝখানটা একেবারে ফাঁকা অর্থাৎ সেখানে হাওয়া নেই। হাওয়ার মধ্যে দিয়ে তাপ পালায় যত কম, ফাঁকা জায়গার মধ্যে দিয়ে পালায় তার চেয়েও কম। ফ্লাস্‌কের গরম জিনিস তাই সহজে ঠাণ্ডা হতে পারে না।

হাওয়ার এই কৌশলটা পাখিদেরও অজানা নয়। পাখিদের তো শীতের লেপ নেই, তাই শরীরের পালকই হল তাদের লেপ। পালকগুলোকে ফুলিয়ে ধরলে তার মধ্যে হাওয়া আটকা পড়ে। আর এই হাওয়ার আবরণ তাদের শরীরের তাপকে ঠেকিয়ে রাখে; শীতের দেশের পাখি ছাড়া আরো অনেক জন্তু পুরু লোমের মধ্যে হাওয়া জমিয়ে রেখে শীতের হাত থেকে গা বাঁচায়।

তোমাদের বুঝি মনে হচ্ছে ঃ আহা! আমাদেরও যদি অমনি পুরু লোম কি পালক থাকত, তাহলে আর মোটেই ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতে হতো না। মানুষের গায়ের ওপর এ রকম শীত ঠেকানো আস্তরণের ব্যবস্থা নেই, তার কারণ মানুষ চারপাশের পরিবেশের উপযোগী জিনিসপত্র তৈরি করে আবহাওয়াকে অনেকখানি বাগ মানাতে পারে। আমাদের বড় বড় লোম নেই, কিন্তু লেপ আছে। অবশ্য অনেকের তো লেপও নেই। কিন্তু তার জন্যে গায়ে লোম গজাবার চাইতে বরং এমন সমাজ-ব্যবস্থা দরকার যেখানে সবারই উপযুক্ত শীতের পোশাক আর আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকবে।

ঠাণ্ডা লেগে কাবু

একটু শীত শীত পড়তে শুরু করেছে কি না করেছে অমনি নীলুর শুরু হয়ে গেল ঃ হ্যাঁ-চ্ চো-, হ্যাঁ-চ্-চো-! সে হাঁচি আর থামতে চায় না। সারা দিন নাক দিয়ে কেবল পানি গড়ায়। মুছতে মুছতে নাক টন্‌টন্ করছে। হাঁচতে হাঁচতে সারা মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে।

কি ব্যাপার?—না, ঠাণ্ডা লেগেছে। ওর অমনি। একটু ঠাণ্ডা লাগলেই নাকের পানি চোখের পানিতে একাকার হয়। গলায় সেঁক-টেঁক দিতে হয়। গরম জামা-কাপড় পরে বাড়িতে বসে দু'চারটে বড়ি-টড়ি গিলতে হয়। তারপর হপ্তা খানেক পরে সর্দি থামে।

কিন্তু আবার! শীত চলে গিয়ে একটু আধটু গরম পড়তে শুরু করেছে। আর সবাই হয়তো বলছে ঃ আহা কি মিষ্টি বসন্তের হাওয়া! কিন্তু না, নীলুর শুরু হয়ে যায় সেই ফ্যাঁচ-চো, ফ্যাঁচ-চো। আবার সেই নাকে পানি! বাইরে তো বেরুবার উপায় নেই। তাই নীলু চোখমুখ ফুলিয়ে ঘরেই বসে থাকে।

এবার কি হল? না, হঠাৎ কি করে নীলুর আবার ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে।

ও—, ভাবছ বুঝি ঠাণ্ডা লাগলেই সর্দি হয়, কিন্তু তাহলে মেরুর দেশের

লোকদের তো সারা বছর সর্দি লেগেই থাকত। ওদের নাকের পানির স্রোত আর কিছুতেই ঠেকান যেত না।

কি বললে ঃ ওদের সহ্য হয়ে গিয়েছে?—জ্বী না, তা নয়। গরমের দেশ থেকে যারা মেরুর রাজ্যে অভিযানে গিয়েছে, তাদেরও তো ওখানে একদিনও সর্দি লাগেনি। বরং মেরু-অভিযাত্রীরা ওই ঠাণ্ডার রাজ্যে থেকে গরমের দেশে ফিরে এলেই তাদের সর্দিতে পেয়েছে।—তবে আমাদেরই বা ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয় কেন?

হ্যাঁ, এইবার এসো। গোলমেলে প্রশ্ন। জবাব পেতে বিজ্ঞানীদের কাছে যেতে হবে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, আসলে শুধু ঠাণ্ডা লাগলেই সর্দি হয় না। সর্দি হয় এক রকম খুদে খুদে জীবাণু থেকে। একটু ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে ভাব হলে এই জীবাণুগুলো মানুষের শরীরের আক্রমণ করার বেশি সুবিধে পায়।

হয়তো জিজ্ঞেস করবে ঃ সর্দি যে জীবাণু থেকে হয় তার প্রমাণ কি? সে প্রমাণও দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা দেখেছেন অথই মহাসমুদ্রের মধ্যে সভ্য জগৎ থেকে দূরে অনেক ছোট ছোট দ্বীপ আছে, যেখানে কখনো কারো সর্দি হয় না। কিন্তু হয়তো দেখা গেল বাইরের কোন দেশ থেকে একটা জাহাজ এসে ভিড়েছে সেখানে। সে জাহাজের কারো বুঝি সামান্য একটু সর্দি ছিল। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্দি ছড়িয়ে পড়ল সারাটা দ্বীপ জুড়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে সর্দি একটা সংক্রামক ব্যাপার—একজন থেকে আরেক জনের হয়; আর সেটার আসল কারণ হচ্ছে এক রকম জীবাণু। এ জীবাণুও কিন্তু আর আর রোগের মতো সাধারণ জীবাণু নয়। আর সব জীবাণুর চেয়ে এগুলো আকারে অনেক ছোট—এধরনের জীবাণুদের নাম রাখা হয়েছে 'ভাইরাস' (Virus)।

অন্য সব সাধারণ জীবাণুকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়, কিন্তু সর্দির ভাইরাসকে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখবার কোন উপায় নেই। লোকের নাক থেকে তরল সর্দি নিয়ে এমন ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ফেলা হয়েছে, যার ভেতর সাধারণ জীবাণু সব আটকা পড়ে যাবে। তারপরও সেই তরল জিনিস মানুষ বা বানরের নাকে দিয়ে দেখা গিয়েছে তাতে তাদের সর্দি লেগে যায়। মানুষ থেকেই বানর, বনমানুষ শিম্পাঞ্জী এদের সর্দি হয়।

আচ্ছা, জীবাণু থেকে যদি সর্দি হয় তবে গরমের দিনে এই জীবাণুগুলো যায় কোথায়?—গরমের দিনেও অল্প কিছু লোকের সর্দি লাগে, তাতেই জীবাণুগুলো সব সময় বাসা বাঁধবার একটা না একটা জায়গা পায়ই। তাছাড়া কিছু লোকের শরীরে সর্দির জীবাণু থাকলেও বাইরে থেকে সেটা বোঝা যায় না; তারাই জীবাণুগুলোকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

জীবাণু থেকে সর্দি হয় বলে যে জীবাণু নাকের ভেতর ঢুকলে অমনি সর্দি লাগবে এমন কোন কথা নেই। আবহাওয়া আর পরিবেশের ওপরও অনেকখানি নির্ভর করে। তাছাড়া অনেক সময় একজনের খুব সর্দি, অথচ তার কাছাকাছি থেকেও আরেকজনের হয়ত মোটেই সর্দি লাগল না। এই ব্যাপারগুলোকে বিজ্ঞানীরা আজো পুরোপুরি বুঝতে পারেন নি। এসব ব্যাপার নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে।

সর্দি নিয়ে বিজ্ঞানীরা আগে বিশেষ মাথা ঘামান নি। তার কারণ সর্দিতে কাজকর্ম করা মুশকিল হলেও ব্যাপারটাকে লোকে তেমন গায়ে লাগায় না। ডাক্তারের কাছে যদি লোকে সর্দির ওষুধের জন্যে না আসে আর দু'পয়সা রোজগার না হয় তাহলে ডাক্তার সর্দি নিয়ে মাথাই বা ঘামাবে কেন?

আজকাল সর্দি সম্বন্ধে নানা রকম গবেষণা হচ্ছে। তবে তার একটা মস্ত বড় অসুবিধে হল ইঁদুর , গিনিপিগ এমনি যে সব জীবের ওপর অন্যান্য রোগের পরীক্ষা হয়, তাদের কারো সর্দি লাগে না। লাগে কেবল মানুষের আর শিম্পাঞ্জী, গরিলা এই সবের। কিন্তু শিম্পাঞ্জী, গরিলা তো আর গবেষণাগারের জন্যে হাজারে হাজারে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় কেবল মানুষ। কাজেই সর্দি পরীক্ষার জন্যে সরাসরি মানুষকেই 'গিনিপিগ' বানাতে হয়।

বিজ্ঞানীরা এ সব পরীক্ষা থেকে দেখেছেন, একজন সুস্থ মানুষের নাকের কাছে এসে সর্দি ঝাড়লে, কিংবা তার নাকে তরল সর্দির কয়েক ফোঁটা ঢেলে দিলেও মোটামুটি শতকরা পঞ্চাশ জনের সর্দি লাগে—বাকি পঞ্চাশ জনের লাগে না। তাদের কেন লাগে না, সে এক সমস্যা অর্থাৎ মোটামুটি অর্ধেক লোক সামান্য সর্দির আক্রমণকে ঠেকাতে পারে। অবশ্য এই ঠেকানোর ক্ষমতাও যে সব সময় একই রকম থাকবে তার কোন মানে নেই। আজ যার সর্দি হচ্ছে না, হয়তো সাত দিন পরে তারও হবে।

একবার বিলেতে প্রায় দু'হাজার লোককে নিয়ে এমনিভাবে সর্দি লাগানোর একটা পরীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা যায় অনেকেরই প্রথম দিনে একটু সর্দির ভাব

হলেও সেটা তার পরদিনেই সেরে গিয়েছে। সম্ভবত বেশির ভাগ সর্দি এইভাবে আপনা আপনি দমে যায়। পরীক্ষায় আরো ধরা পড়েছে, সর্দি বয়সের তেমন বাছবিচার করে না। দেখা যায় ১৮ থেকে ৪০ বছরের লোকদের সবারই প্রায় সমানভাবে সর্দি লাগছে।

সর্দির ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করার একটা অসুবিধে হচ্ছে অন্যান্য জীবাণুর মতো একে সহজে চাষ করা যায় না। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন অন্যান্য ভাইরাসের মতো একে মুরগির ডিমের কুসুমে চাষ করতে—কিন্তু এটা এখনও সবক্ষেত্রে সফল হয় নি।

খুব সূক্ষ্ম জালের ভেতর দিয়ে সর্দি ছেঁকে দেখা গিয়েছে ৫৭ মিলিমাইক্রন ফাঁকের ভেতর দিয়েও সর্দির জীবাণু পেরিয়ে যেতে পারে—অথচ আর কোন জীবাণু তা পারে না। তাতে মোটামুটি সর্দির জীবাণুর ব্যাস ধরা যায় ৬০ মিলিমাইক্রন —অর্থাৎ প্রায় দেড় লাখ ভাইরাস পাশাপাশি সাজালে তবে তার মাপ হবে এক সেন্টিমিটার। সব সর্দির ভাইরাস আবার এক নয়। বিজ্ঞানীরা নানা মাপের অন্তত বিশ রকমের সর্দির ভাইরাসের খোঁজ পেয়েছেন।

আজকাল নানা রকমের অ্যান্টিবায়টিক ওষুধ বেরোবার ফলে রোগ জীবাণুদের ঘায়েল করা অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। অন্যান্য বেশির ভাগ জীবাণুকেই পেনিসিলিন বা স্ট্রেপটোমাইসিন দিয়ে কাবু করা যায়; কিন্তু সর্দির ভাইরাসকে এভাবে মোটেই কাবু করা যায় না। ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস রক্তের লাল কণার মধ্যে মিশে যায়, সর্দির ভাইরাস তাও যায় না।

ঠিক কতটা ভাইরাস শরীরে ঢুকলে সর্দি লাগবে তা বলার কোন উপায় নেই। তার কারণ এক এক জনের শরীরে সর্দি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এক এক রকম। তবে পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, কারো নাক থেকে তরল সর্দি নিয়ে তাতে হাজার গুণ পানি মেশাবার পরেও তার কয়েক ফোঁটা আরেকজন সুস্থ লোকের নাকে দিলে তার সর্দি লেগে যায়।

মুখের লালার মধ্যেও সর্দির জীবাণু থাকে। হাঁচি দেবার সময় এই সব জীবাণু ছিটকে বেরিয়ে আসে। হাঁচির কণা বাতাসে অনেকক্ষণ ধরে ভাসতে থাকে। হয়তো কাপড়-চোপড়ে, ঘরের আসবাবপত্রে গিয়ে লাগে। তারপর আবার শুকিয়ে গিয়ে বাতাসে ওড়ে। রুমালে যে সর্দি শুকিয়ে লেগে থাকে, রুমাল ঝাড়লে তাও বাতাসে মিশে যায়। এই সব জীবাণু সুস্থ মানুষের নাকে গেলে তারও সর্দি লাগে।

সর্দি নিয়ে একটা মুশকিল হচ্ছে হাম ইত্যাদি রোগ যেমন একবার হয়ে গেলে একই লোকের সহজে আর হয় না—শরীরে আপনা আপনি একটা প্রতিরোধ শক্তি জন্মে যায়—সর্দির বেলায় সাধারণত তেমনটা হয় না। একবার সর্দি হয়ে সেরে যাবার দু'-এক সপ্তাহ পরেই হঠাৎ আবার সর্দি লেগে যেতে পারে। এর একটা কারণ হয়তো এই যে, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা এসব রোগের জীবাণু রক্তে গিয়ে মেশে; আমাদের দেহে রোগ ঢোকাবার জন্যে যে সব অ্যান্টিবডি বা প্রতিবীজ জন্মায় সেগুলোও থাকে রক্তে। কিন্তু সর্দির বেলায় জীবাণু থাকে নাকের এবং শ্বাসনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ওপরে। রক্তের প্রতিবীজ সেখানে তাদের কাবু করতে পারে না।

সর্দির ব্যাপারটা এমন গোলমেলে বলে, আর এ সম্বন্ধে তেমন ব্যাপক গবেষণা না হওয়ায় সর্দির চিকিৎসাও তেমন ভাল নেই। বাজারে অনেক ওষুধ পাওয়া যায় সর্দির জন্যে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় ধরা পড়েছে, বেশির ভাগ ওষুধ ব্যবহারে যে ক'দিনে সর্দি সারে, সে ওষুধ ব্যবহার না করেও মোটামুটি সেই ক'দিনেই সারে। সাধারণত অনেক সর্দি প্রথম অবস্থায় আপনা আপনি দমে যায়; তার ফলে অনেকের ধারণা হয় বুঝি ওষুধের বদৌলতেই সর্দি কাবু হয়েছে। কোন কোন ওষুধ দিয়ে সর্দির যন্ত্রণা কিছুটা কমানো যায়; কিন্তু এর সত্যিকার ওষুধ আজো বেরোয় নি।

মেঘে মেঘে টক্কর

আমাদের এ বাদলার দেশে বোশেখ মাস থেকেই শুরু হয় কাল-বোশেখির ঝড়। ক্রমে ক্রমে আসে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ—বর্ষা শুরু হয় পুরোদমে।

বর্ষার এই সময়টা এমনি যে, দিন নেই, রাত নেই, টিপ টিপ ঝম ঝম বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছে। তাছাড়া আবার মাঝে মধ্যেই আছে ঝড়। আকাশ অন্ধকার করে মেঘ জমে, শোঁ শোঁ বাতাস বইতে থাকে, কড় কড় করে বিজলি ঝিলিক দিয়ে যায়। তারপর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ঝড় ওঠে। ভাঙ্গে মানুষের বাড়ি-ঘর, নষ্ট হয় মাঠভরা ফসল—মাতাল ঝড়ের দাপটে দুনিয়া থর থর করে কাঁপতে থাকে।

ঝড়ে অনেক সময় লোকও মারা যায়। ১৩৭৬-এর পয়লা বোশেখ এক আচমকা ঘূর্ণিঝড়ে ঢাকা আর কুমিল্লায় হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছিল। চাটগাঁয় একবার ঝড়ে মারা পড়েছিল প্রায় তিন হাজার লোক। তাছাড়া কত লোকের বাড়ি-ঘর ভেঙ্গেছে তার তো লেখাজোখাই নেই। ঝড়ের সময় বাজ পড়েও অনেক লোক মারা যায়।

শুধু আমাদের দেশেই নয়—প্রত্যেক বছর সারা দুনিয়ায় বহু লোক এমনি করে প্রাণ হারায়। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন সারা দুনিয়ায় বছরে বজ্রসহ ঝড়বৃষ্টি হয় নব্বই কোটি বারেরও বেশি—গড়পড়তা মিনিটে ১৮,০০০ বারের মতো।

এই সব বজ্র-বিদ্যুৎ-ঝড়কে মানুষ ভয় করে এসেছে সেই আদিকাল থেকে।

আগের দিনের লোকেরা মনে করত, ঝড় আর বজ্র নিশ্চয়ই দেবতাদের কাণ্ডকারখানা। দেবতারা যখন কোন কারণে মানুষের ওপরে অসন্তুষ্ট হন তখনই ঝড়ে ঘড়-বাড়ি ভাঙ্গে। তাঁদের ক্রুদ্ধ অভিশাপ নিয়ে বজ্র নেমে আসে; মাঠের ওপর যেখানে বজ্র পড়ে সেখানকার ফসলের চারাগুলো পুড়ে কালো হয়ে ওঠে। নানান দেশের পুরাণ আর ধর্মীয় কাহিনীতে ঝড়ের দেবতা, বজ্রের দেবতার কথা পাওয়া যায়। যেমন, ইউরোপের দেবরাজ জুপিটার, বজ্রের দেবতা থর; কিংবা হিন্দুদের দেবরাজ ইন্দ্র, বরুণ।

বজ্র যে কি জিনিস তা এখনও আমাদের দেশে অনেকেই জানে না। কেউ কেউ মনে করে, বিজলি চমকাবার সময় বুঝি ফেরেশ্‌তাদের সোনার কোড়ার টুকরো ভেঙ্গে পড়ে পৃথিবীর ওপর। প্রবাদ আছে, কলা গাছের ওপর বাজ পড়লে সেখানে মাটি খুঁড়ে সোনা পাওয়া যায়।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে আমেরিকার বেন্‌জামিন ফ্র্যাংকলিন এই বজ্রের রহস্য ভেদ করেন।

সে এক তুমুল ঝড়ো দিন। কিন্তু সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই ফ্র্যাংকলিন তাঁর রেশমী ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়েছেন আকাশে। ঘুড়ির সুতোর মাথায় তিনি লাগিয়েছেন একটা লোহার চাবি। সেই চাবির গায়ে হাত দিয়ে বুঝা গেল, চোখ ধাঁধাঁনো আলোর ঝিলিক দিয়ে আকাশ থেকে কড় কড় করে যে বাজ পড়ে সেটা বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। সঙ্গে সঙ্গে বাজের হাত থেকে বাঁচবার একটা কায়দাও জানা গেল; বাড়ির ওপর উঁচু করে সরু সরু তার বসালে বাজ পড়ার বিজলি সেই তার বেয়ে সহজেই মাটির ভেতরে চলে যেতে পারে।

আলো চলে এক সেকেণ্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার বা এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে। তাই আকাশের মেঘে বিজলি চমকালে আমরা চোখের পলকে তার আলো দেখতে পাই; কিন্তু কানে তালা লাগানো শব্দটা আমাদের কাছে এসে

পৌঁছতে বেশ কিছুক্ষণ সময় নেয়। শব্দ প্রায় তিন সেকেণ্ডে এক কিলোমিটার পথ চলতে পারে। কাজেই বিজলির চমকানি দেখা দেবার পর তার শব্দ শুনতে যে কয় সেকেণ্ড সময় লাগে তাকে তিন দিয়ে ভাগ করলেই জানা যায় মেঘটা পৃথিবী থেকে কত কিলোমিটার উঁচুতে রয়েছে।

বিজলি আজ আর মানুষের কাছে নতুন জিনিস নয়। বিজলিকে মানুষ হরেক রকমের কাজে লাগিয়েছে। মানুষের ঘরে ঘরে জ্বলছে বিজলির আলো, কল-কারখানা চলছে বিজলির জোরে। সারা দেশ জুড়ে থাম পুঁতে বসানো হয়েছে বিজলির তার। কিন্তু কোথাও বিজলির তারের ওপর বাজ পড়ল কি সর্বনাশ হল—সব আলো দপ করে নিভে যাবে।

এই বিজলির যুগে আজ অনেকের বাড়িতেই রেডিও আছে। হয়তো বৃষ্টির সময় দিব্যি আরামে ঘরে বসে গান-বাজনা শুনছ; কিন্তু যদি বাইরে বিজলি চমকাতে থাকে তাহলে রেডিওতে শুরু হবে উপদ্রব।

কাজেই এই সব বিপদ এড়ানোর জন্যে আকাশের বিজলির কথা ভাল করে জানা দরকার। এই বিশ শতকের গত কয়েক দশকে বিজ্ঞানীদের চেষ্টার ফলে এ বিষয়ে অনেক নতুন কথাই জানা গিয়েছে।

ঝড় কি করে হয়, জান তো? ধর কোন জায়গার ভেজা বাতাস আশেপাশের বাতাসের চেয়ে গরম হয়ে উঠল। তখন এই বাতাস হালকা হয়ে ওপরের দিকে ওঠে, আর ওপরের ফাঁকা জায়গা পেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ দিকে বাতাস যতই ছড়িয়ে পড়ে ততই সেটা ঠাণ্ডা হয়। সাইকেলের চাকায় পাম্প করে চেপে বাতাস পোরবার সময় বাতাসটা গরম হয়ে ওঠে—পাম্পের গায়ে হাত দিলেই সেটা টের পাবে। এখানে হয় তার উলটো ব্যাপারটা ।

বাতাস ঠাণ্ডা হতে থাকলে ওর ভেতরকার জলীয় বাষ্পগুলো জমে গুঁড়ো গুড়ো কুয়াশার কণা হয়, তারপর বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে থাকে। বেশি ঠাণ্ডা হলে এই সব বৃষ্টির ফোঁটা জমে শিল হয়ে যায়।

কখনো কখনো ওপর দিকে ওঠা গরম বাতাস আর নিচের দিকে নামা ঠাণ্ডা বাতাসে ঠোকাঠুকি লেগে যে প্রলয় কাণ্ড বাঁধে সে আর বলবার নয়। আকাশের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা, শিল ঠাণ্ডা আর গরম হাওয়ায় মিলে তুমুল ঘূর্ণিনাচন চলতে থাকে—বাতাসের বেগ তাতে ঘণ্টায় দেড়শো কিলো-মিটারের ওপর ওঠে কখনো কখনো এই বাতাসের সঙ্গে তিন লক্ষ টন পর্যন্ত পানি ভেসে থাকে। ঝড়ো মেঘের এই প্রলয় নাচন আর লুটোপুটির ফলে বাতাসের ঘষায় ঘষায় মেঘের ফোঁটায় তৈরি হয় ঘর্ষ বিদ্যুৎ। কাচের গায়ে রেশম বা শুকনো চুলে চিরুনি ঘষলেও এমনি বিদ্যুৎ তৈরি হয়।

আকাশের বিদ্যুৎ সম্বন্ধে জানার জন্যে বিজ্ঞানীরা নানা রকম পরীক্ষা করেছেন। যেমন ধর, মেঘের ওপরকার বিদ্যুতের অবস্থা জানবার জন্যে তাঁরা সরু তারের সাথে ছোট ছোট বেলুন বেঁধে উড়িয়ে দিলেন। মেঘের বিদ্যুৎ সেই তার বেয়ে নেমে এল মানুষের কাছে। দেখা গেল, ঝড়ো মেঘের মাথার ওপরটা সব সময়েই পজিটিভ বিদ্যুৎ ধর্মী হয়। তলার দিকটা থাকে নেগেটিভ বিদ্যুৎ ধর্মী; তবে তার মাঝে এখানে ওখানে একটু আধটু জায়গায় ওয়েসিসের মতো পজিটিভ বিদ্যুৎ লেগে থাকে। উইল-সন নামে একজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, বাজ পড়বার সময় সাধারণত মেঘের গায়ে থাকে নেগেটিভ বিদ্যুৎ আর পৃথিবীর ওপরটা হয় পজিটিভ। নেগেটিভ বিদ্যুৎওলা ঝড়ো মেঘ যেখান দিয়ে উড়ে যায় তার বিদ্যুতের আকর্ষণে পৃথিবীর ওপরকার পজিটিভ বিদ্যুৎ এক ঝাঁক মৌমাছির মতো সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে থাকে।

এক একটা ঝড়ো মেঘে যে পরিমাণ বিজলি জমে, মাপতে গেলে তার পরিমাণ হবে বিরাট। কোন মেঘে যদি প্রত্যেক দশ সেকেণ্ডে একবার করে বিজলি চমকায় তাহলে বুঝতে হবে তাতে দশ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি রয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে একটি বড়সড় পাওয়ার হাউস যে পরিমাণ বিজলি তৈরি করে তার সমান।

মেঘ আর পৃথিবীর নেগেটিভ আর পজিটিভ বিদ্যুতের আকর্ষণ যখন খুব বেশি হয়ে দাঁড়ায় তখন মেঘের বিদ্যুৎ পৃথিবীতে নামবার সব চাইতে সহজ পথ খুঁজে বের করার জন্যে সন্ধানী দূত পাঠায়। ছোটখাট রকমের একটা ঝলক নামে পৃথিবীতে, সাপের মতো এঁকেবেঁকে, ধাপে ধাপে—তার এক একটা ধাপ প্রায় পঞ্চাশ মিটার লম্বা। এতে বাতাস গরম হয়ে ওঠে। আর তার ভেতর দিয়ে সহজেই বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে। তখন আগের বারের চেয়ে অনেক বড় একটা বিদ্যুতের ঝলক পৃথিবী

থেকে লাফিয়ে মেঘের ওপর চলে যায়, ঘণ্টায় তার বেগ হয় প্রায় সাড়ে তিন কোটি কিলোমিটার; এইটেই হল আসল বাজ পড়া। এর পরেও সাধারণত একই পথে ঝলকে ঝলকে এদিক ওদিক আরো বিদ্যুৎ আনাগোনা করে।

যে পথে বাজ পড়ে সেখানকার বাতাস হঠাৎ গরম হয়ে প্রচণ্ড রকম ফেঁপে ওঠে। তারপর এই গরম বাতাস যখন আবার ঠাণ্ডা হয়ে চুপসে যায় তখন চারপাশ থেকে আরো বাতাস ছুটে এসে তার জায়গা দখল করে। বাতাসের এই আলোড়নেই আমরা বাজ পড়ার কানে-তালা লাগানো কড়-কড় শব্দ শুনতে পাই।

বাজ পড়ে শুধু যে মানুষের ঘড়-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় তা নয়। বাজ মানুষের উপকারও করে। বাতাসের পাঁচ ভাগের চার ভাগই তো হল নাইট্রোজেন গ্যাস কজেই প্রত্যেক বার বিজলি চমকাবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন গ্যাস বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে তৈরি হয় নাইট্রাস অ্যাসিড; তারপর তা বৃষ্টির সঙ্গে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। এই নাইট্রোজেন সব রকমের গাছপালা ফসলের জন্যে অপরিহার্য। গাছপালা থেকেই মানুষ বা অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার এই নাইট্রোজেন নেয়। আবার গাছপালা, ঝরাপাতা, জন্তু-জানোয়ার পচবার ফলে অনাবৃত নাইট্রোজেন বেরিয়ে মিশছে বাতাসে।

বাতাসের বেশির ভাগ নাইট্রোজেন হলেও গাছপালা বাতাস থেকে যে নাইট্রোজেন নিতে পারে না—মাটির রসের ভেতর থেকে রাসায়নিক লবণের আকারে নেয়। আকাশের বিজলি বাতাসের নাইট্রোজেনকে গাছপালার খাদ্য করে মাটির বুকে ফিরিয়ে দেয়। একজন বিজ্ঞানী হিসাব করে বলেছেন, আকাশের বিজলি থেকে বছরে প্রায় দশ কোটি টন নাইট্রাস অ্যাসিড তৈরি হয়। সারা দুনিয়ার সবগুলো সার কারখানা মিলেও গাছপালার জন্যে এত সার তৈরি করে না। এমনি করে ঝড়ো মেঘ প্রকৃতির জীবন-প্রবাহকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

বাজ আর বিজলি সম্পর্কে নানা রকম পরীক্ষা করতে করতে আজকাল বিজ্ঞানীরা পাওয়ার হাউস থেকে বহু দূরে বিজলি বয়ে নিয়ে যায় যেসব তার সেগুলোকে বাজ পড়ার হাত থেকে বাঁচবার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। তাছাড়া এমন সব শক্তিশালী যন্ত্র তৈরি হয়েছে যা দিয়ে আকাশের বিজলির মতো বড় বড় বিজলির ঝলক আজকাল ঘরে বসেই তৈরি করা যায়।

কে বলবে, একদিন হয়তো মানুষ আকাশের বাজকেও আয়ত্ত করার কায়দা শিখে ফেলবে। সেদিন মেঘের বিজলি সরাসরি আমাদের ঘরে ঘরে আলো দেবে, তাপ দেবে, শক্তি দেবে। আর সব চাইতে বড় কথা, ঝড় আর বজ্রের ভয় সেদিন মানুষের আরো অনেক কমে যাবে।

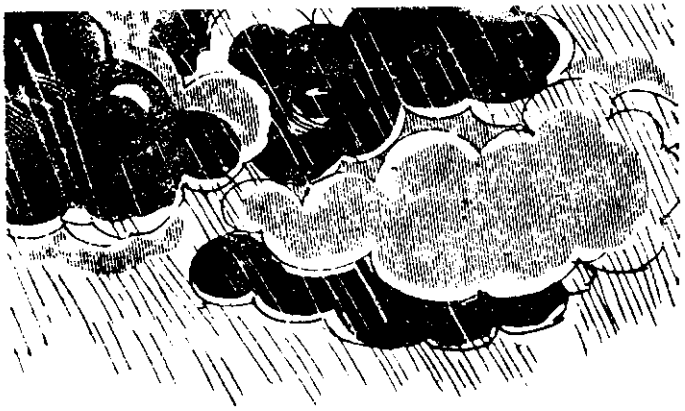

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে

মাঠে যত দূর চোখ যায় কেবল সবুজের বন্যা। কচি কচি ধানের চারাগুলো মাথা তুলেছে। সারা মাঠ জুড়ে কে যেন বিছিয়ে দিয়েছে বিরাট একখণ্ড সবুজ মখমল। মাঠভরা ফসলের দিকে তাকিয়ে কৃষাণের বুক আনন্দে আশায় গর্বে ভরে যায়।

কিন্তু এ আনন্দ তার বেশি দিন টিকে না। আকাশে এক ফোঁটা মেঘের দেখা নেই; ছোট ছোট ধানের চারাগুলো বৃষ্টির অভাবে কুঁকড়ে কালো হয়ে ওঠে; বৈশাখের আগুন-ঢালা রোদের তাতে সারাটা মাঠ ঝলসে যায়। বৃষ্টির জন্যে মানুষ তখন আকুল হয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাতে থাকে। কেননা এই অনাবৃষ্টি আকালেরই পূর্বাভাস, সারা বছরের খোরাক রয়েছে তার ওই মাঠের বুকে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যের পর আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে ছড়া কেটে কাপড়ের খুঁটে গেরো বাঁধে। অসহ্য গরম পড়লে পাড়াময় ঘুরে চাল তোলে; একজনকে সাজিয়ে সুর করে ছড়া কেটে তার মাথায় ঘড়ায় ঘড়ায় পানি ঢালে; তারপর বৃষ্টির জন্যে মাটিতে গড়াগড়ি যায়। তবু বৃষ্টি হয়তো নামে, হয়তো বা নামে না।

এখনকার মতো মানুষের যখন এতটা বুদ্ধি-শুদ্ধি হয় নি তখন সেই আদিম যুগের মানুষেরা মনে করতো বৃষ্টির বুঝি একটা দেবতা আছে, তিনি যখন কোন কারণে অসন্তুষ্ট হন তখনই অনাবৃষ্টি আর আকাল নামে। বৃষ্টি যে কখন কেন হয় সে সব কিছুই তারা বুঝত না; শুধু জানতো, বৃষ্টি নামলে ফসল ফলে, নইলে চাষ বাস সব নষ্ট হয়ে যায়। তাই বৃষ্টি না হলেই দল বেঁধে নেচে, গান গেয়ে তারা বৃষ্টির দেবতাকে খুশি করবার চেষ্টা করতো। সেই সব আচার অনুষ্ঠানের রেশ আজো মানুষের মধ্যে এখানে সেখানে কিছুটা রয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আজ তো বৃষ্টি কি করে হয় তা আমরা জানি। সাগর থেকে বাষ্প হয়ে ওঠা পানির ঝাঁপি নিয়ে মেঘ উড়ে আসে। পাহাড়ের বাধা পেয়ে আকাশের ওপরে উঠতে উঠতে ঠাণ্ডা হয়ে বাতাসের ধুলোর কণায় বৃষ্টির ফোঁটা জমে। তারপর সেই ভারি হয়ে ওঠা ফোঁটাগুলোকে মেঘ যখন আর ধরে রাখতে পারে না তখনই নামে বৃষ্টির ধারা।

এমনি বৃষ্টি বয়ে আনা মৌসুমী হাওয়া কখন কোন্ দিক থেকে বইবে আবহাওয়া অফিস তাও আজ বলে দিতে পারে। তাই বৃষ্টি বা আবহাওয়ার ব্যাপার-স্যাপার আজ আর মোটেই রহস্যময় নয়; মানুষ আজ ঝড়বৃষ্টির কারণ বোঝে। আর তাই কখন বৃষ্টি হবে না হবে, আবহাওয়া কখন কিভাবে বদলাবে না বদলাবে, তাও বেশ আগে থেকেই বলে দেওয়া যায়।

কিন্তু একটা ব্যাপার কখন কিভাবে ঘটবে শুধু আগে থেকে বলতে পারা এক কথা, আর নিজেদের দরকার এবং ইচ্ছে মতো সেটাকে বদলাতে পারা একেবারে অন্য কথা।

বিজ্ঞানীরা হয়তো বলতে পারলেন, আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে কোন বৃষ্টি হবে না। কিন্তু সেটা জানাই তো শুধু যথেষ্ট নয়। প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না থেকে মানুষ কি নিজের ইচ্ছে মতো বৃষ্টি নামাতে পারে না? আজকের বিজ্ঞানীরা বলছেন ঃ হ্যাঁ পারে—অনিচ্ছুক প্রকৃতির কাজ থেকে মানুষ বৃষ্টি আদায় করে নিতে পারে।

এটা জানা কথা ঃ আকাশের ওপরের স্তরে বেশি ঠাণ্ডা পেলেই মেঘের বাষ্প বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ওঠে; আরো বেশি ঠাণ্ডা হলে একেবারে বরফের শিল হয়ে যায়। হয়তো দেখা গেল আকাশে মেঘ ভেসে যাচ্ছে অথচ নিচে মাটি একেবারে ফুটিফাটা, বহুদিন বৃষ্টি হচ্ছে না। তার অর্থ—ওপরে মেঘ এখনও যথেষ্ট ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়া পাচ্ছে না, যাতে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা জমতে পারে। এখন প্রশ্ন হল কি করে আকাশের ওপর ঐ মেঘকে যথেষ্ট পরিমাণে ঠাণ্ডা করে তাকে বৃষ্টি ঝড়াতে বাধ্য করা যায়। আশ্চর্যের কথা, ব্যাপারটাকে খুব কঠিন মনে হলেও বিজ্ঞানীরা আজ একে সম্ভব করে তুলেছেন।

বাতাসে একটা গ্যাস আছে তার নাম কার্বন ডাই-অক্সাইড। আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুক থেকে যে হাওয়া বেরিয়ে আসে, তার বেশির ভাগই হচ্ছে এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। পানিকে যেমন ঠাণ্ডা করতে করতে বরফ করে ফেলা যায়, তেমনি এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকেও বেজায় রকমের ঠাণ্ডা করলে বরফের মতো জমাট শক্ত হয়ে যায়। দেখতে অনেকটা বরফের মতো আর অত্যন্ত ঠাণ্ডা বলে এর সাধারণ নাম হচ্ছে 'dry ice' বা 'শুকনো বরফ'। জ্বরের ঘোরে কেউ যখন প্রলাপ বকতে থাকে তখন তার গায়ের তাপ ওঠে একশো পাঁচ কি ছ' ডিগ্রী। কিন্তু শুকনো বরফের তাপ ফারেনহাইড থার্মোমিটারের শূন্যেরও ১০৯ ডিগ্রী নিচে। তাই একে সব সময় ঠাণ্ডা জায়গায় রাখতে হয়, বাইরে খোলা রাখলে সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া হয়ে উড়ে যায়।

এমনি জমাট কার্বন ডাই-অক্সাইডের গুঁড়ো উড়োজাহাজে করে মেঘের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞানীরা বৃষ্টি নামানোর কায়দা আবিষ্কার করেছেন। শুকনো বরফ মেঘের ওপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উবে যেতে থাকে, আর কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসের চেয়ে ভারি বলে ক্রমে ক্রমে নিচের দিকে নামে। তাতেই সমস্তটা মেঘ তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে জমে যায়। স্পিরিট যখন হাতের ওপর উবে যেতে থাকে তখন হাতে কেমন ঠাণ্ডা লাগে, তাই না? ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকম।

সমস্তটা মেঘের স্তর যাতে ঠাণ্ডা হতে পারে তার জন্যে মেঘের স্তরের রকম দেখে 'শুকনো বরফকে' কুচি কুচি টুকরো করে নেওয়া হয়। মেঘ যদি হয় হাজার মিটার পুরু তাহলে ধানের মতো ছোট ছোট কুচি করা হয়, তার চেয়ে পুরু হলে কুচির আকারও তেমনি বড় হয়।

কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া সিলভার আয়োডাইড নামে আর একটা রাসায়নিক উপাদান দিয়েও কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামানো সম্ভব হয়েছে। তবে এটাকে ধোঁয়ার

আকারে ছাড়া হয় মাটি থেকে। সিলভার আয়োডাইডের সূক্ষ্ম কণাগুলো যখন মেঘের স্তরে গিয়ে পৌঁছায় তখন এই কণার গায়ে গায়ে পানির ফোঁটা জমতে থাকে। তারপর ফোঁটা বড় হলে এক সময় বৃষ্টি শুরু হয়।

জমাট কার্বন ডাই-অক্সাইড ছড়িয়ে বৃষ্টি নামাতে যে বেশি খরচ পড়বে তা নয়। 'শুকনো বরফ' জিনিসটা খুব সস্তায় পাওয়া যায়। অবশ্য এর জন্যে এরোপ্লেন রাখবার ঝামেলা আছে; সেগুলো সরকারি খরচায় রাখা হবে, দরকার মতো সেখান থেকে ভারা পাওয়া যাবে। কিন্তু এভাবে সময়মতো বৃষ্টি নামিয়ে অনাবৃষ্টির হাত থেকে যে পরিমাণ ফসল বাঁচানো যাবে তার দাম এই খরচার চেয়ে বহু গুণ বেশি।

এভাবে বৃষ্টি নামাতে হলে কার্বন ডাই-অক্সাইড যে খুব বেশি ছড়াতে হবে তাও নয়। অবশ্য পরিমাণটা নির্ভর করে মেঘের ধরনের ওপর। সাধারণত প্রত্যেক কিলোমিটারে দুশো থেকে তিনশো গ্রাম শুকনো বরফ ছড়ানো হয়। বেশি ছড়ালেই যে বৃষ্টি বেশি হবে তার কোন মানে নেই, বরং ফল উলটো হবারই সম্ভাবনা।

কার্বন ডাই-অক্সাইড পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘের মধ্যেকার পানির কণাগুলো হঠাৎ ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে যায়; তাতে কয়েক মূহূর্তের মধ্যে তুষারকণা জমতে শুরু করে—তারপর চারপাশ থেকে আরো সব পানি এসে তার ওপরে জমতে থাকে। পানির কণাগুলো হঠাৎ এত বেশি ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার ফলে আশেপাশের বাতাসে অনেকখানি তাপ ঢেলে দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে নিরীহ শান্ত মেঘ পরিণত হয় ঝড়ো বাতাস আর শিলাবৃষ্টির অট্টরোলে।

আর তারপর তৃষ্ণার্ত, উন্মুখ পৃথিবীর বুকে ঝম ঝম করে নামে স্নিগ্ধ, শীতল বৃষ্টির ধারা। প্রকৃতির করুণার দান নয়, মানুষের হাতে গড়া বৃষ্টি।

টলমল পদভরে

১৯৫০ সনের ১৫ই আগস্ট। রাত তখন গোটা নয়েক হবে। হঠাৎ ঘড়-বাড়ি দালান-কোঠা সব দুলে উঠল। মাথার ভেতরটা আচমকা বোঁ করে ঘুরে উঠতেই সবাই বুঝতে পারল ব্যাপারটা কী। 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প' : একটা মাতাল দৈত্য যেন তার পায়ের দাপটে পৃথিবী কাঁপিয়ে এগিয়ে আসছে—ক্রমাগত এগিয়ে আসছে·····।

তারপর জানা গেল, দৈত্যটা সারা দেশের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে পাহাড়-নদী, শহর-গ্রাম, বাড়ি-ঘর সব দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গিয়েছে। কেবল আসামেই নয়—ঢাকায়, কোলকাতায়, এমন কি আসাম থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে পর্যন্ত এই ভূমিকম্পের ধাক্কা গিয়ে লেগেছে। রোজকার রোজ খবরের কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হতে লাগল আসামের ভূমিকম্পের খবর।

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দুনিয়াতে এত বড় ভূমিকম্প কখনোও হয় নি। আসামের উত্তর-পুব সীমান্তের কোণায় তিব্বতের পাহাড়ের ভেতর থেকে এই ভূমিকম্পের শুরু। তার জোরালো কাঁপুনির ধাক্কায় প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার দূরে পুণার

মান-মন্দিরে ভূমিকম্পের কাঁপুনি-ধরা যন্ত্রের কাঁটা যায় একদম বিগড়ে। কোলকাতা শহরেও কাঁপুনি-মাপা কাঁটা যন্ত্র থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাহলেই এখন বোঝ কী ভীষণ ব্যাপারখানা!

ভূমিকম্পে আসামের তিন ভাগের দুভাগ এলাকাতেই সব চাইতে বেশি ক্ষতি হয়। হাজার হাজার ঘড়-বাড়ি ভেঙ্গে পড়ে। তার ওপর সবচেয়ে বড় কথা হল, ভূমিকম্পের ফলে পাহাড়ের বিরাট বিরাট ধ্বস নেমে ব্রহ্মপুত্র এবং অন্যান্য নদীর পথ বন্ধ হয়ে যায়। এতে ব্রহ্মপুত্র, ডিব্রু, দিহাং, সুবনসিরি—এই সবগুলো নদীতে বিপুলভাবে বান ডাকে। আর এই বানে সারা দেশ ভেসে গিয়ে হাজার হাজার গরু, মোষ, জন্তু-জানোয়ার, মানুষ মারা পড়ে।

ভূমিকম্পের পরে যাঁরা উড়োজাহাজে করে ওসব এলাকা সফর করে এলেন তাঁরা বললেন, সমস্ত পাহাড়ী দেশের চেহারা রাতারাতি একদম বদলে গিয়েছে। হিমালয় পর্বতের বিরাট একটা অংশকে নাকি আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না—অনেক পাহাড়ের চূড়ো বেমালুম গায়েব হয়ে গিয়েছে। নদীর পথ-ঘাট গিয়েছে বদলে। আবর আর মিশ্‌মি পাহাড়ের কাছে কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা সমস্ত সভ্য জগৎ থেকে একেবারে আলাদা হয়ে পড়েছে।

বড় একটা কাণ্ড ঘটলে যেমন হয়, আসামের ভূমিকম্পের পর নানান জনে এর সম্বন্ধে নানান কথা বলতে শুরু করলেন। কেউ বললেন, গৌরীশৃঙ্গের চূড়োটা এইবার আরও খানিকটা উঁচু হয়ে গিয়েছে। কেউ বলেন, না না, আসল কথা হচ্ছে সমস্ত হিমালয় পাহাড়টাই আস্তে আস্তে দক্ষিণ দিকে নেমে আসছে। আবার কেউ বলেন, ওসব কিছুই নয়—দুনিয়া পাপে-তাপে এমন ভরে উঠেছে যে পৃথিবীর আর মোটেই সহ্য হচ্ছে না, এটা তারই একটা লক্ষণ মাত্র!

কিন্তু যত জনে যত কথাই বলুক, ১৫ই আগস্টের পর থেকে কিছুদিনের মধ্যে আসামের নানা জায়গায় ছোটখাট সব মিলিয়ে কয়েক শো ভূমিকম্প হল। বিজ্ঞানীরা বললেন, ওতে ঘাবড়াবার কিছু নেই; বড় রকম একটা ভূমিকম্পের পর ওসব ছোটখাট ধাক্কার রেশ মিটতে এক বছরও লাগতে পারে।

ভূমিকম্প সম্বন্ধে মানুষের ভয় চিরকালের। আর ভয় থাকবে না-ই বা কেন? এ তো আর বাঘ-ভালুক সাপ নয় যে, দল বেঁধে শিকার করে কাবু করা যাবে। ধরিত্রী যখন হঠাৎ একবার উত্তাল হয়ে ওঠে তখন মাঝে মাঝে একেবারে প্রলয়কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে। কাজেই আগের দিনের মানুষ ভূমিকম্পকে দৈব ব্যাপার মনে করে ভয় করবে, এ তো খুবই স্বাভাবিক।

আগেকার দিনে একদল লোক ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে বলত সহস্র ফণাওয়ালা নাগরাজ বাসুকি পৃথিবীকে তাঁর মাথার ওপর নিয়ে আছেন; মাঝে মাঝে হয়রান হয়ে তিনি পৃথিবীকে এক ফণা থেকে আরেক ফণার ওপর নিয়ে যান—আর তখনই ভূমিকম্প হয়।

গ্রীকদের পুরাণেও ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে এমন ধরনের এক কাহিনী আছে। তবে তারা বলত, নাগরাজ বাসুকি-টাসুকি নয়, পৃথিবীটা রয়েছে আসলে দেবতা হারকিউলিসের কাঁধের ওপরে। তিনি তাকে এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে বদলি করেন; তাই ভূমিকম্প দেখা দেয়।

আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে অবশ্য এ ধরনের কাহিনী আর কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। কেননা, আজকের একেবারে বাচ্চা ছেলেটিও জানে যে, হারকিউলিসের কাঁধও নয় বাসুকির ফণাও নয়, পৃথিবীটা নেহাতই শূন্যের ওপর ঝুলে আছে।

প্রকৃতির নিয়মের রাজত্বে কোন রকম ব্যতিক্রম ঘটলেই প্রলয় হয় —ভূমিকম্পও এমনি একটা প্রলয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা ভাবতেন, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র এগুলো আজকে যেমনটি আছে তেমনি চিরকাল থাকবে; এর কোন রকম ব্যতিক্রমের কথা চিন্তা করাও ছিল তাঁদের কাছে পাপ। তাই কোন জায়গায় হঠাৎ কিছু একটা পরিবর্তন ঘটে গেলেই তাঁরা দারুণ হকচকিয়ে যেতেন।

কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়ার সাথে সাথে মানুষের সব কিছু জানবার ইচ্ছেও বেড়েছে। তার ফলেই আজ আমরা প্রকৃতির এমন নানা রহস্যের খোঁজ পেয়েছি যাতে মানুষের জীবন আগের চাইতে অনেক বেশি সহজ আর সুন্দর হয়ে উঠেছে।

মানুষের এই অজানাকে জানার প্রবল আগ্রহের দরুনই আজ আমরা জানি যে, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র ঠিক আজকে যেমনটি রয়েছে চিরদিন এরকম থাকতে পারে না—পরিবর্তন হবেই। আজ যেখানে বিরাট পাহার দাঁড়িয়ে আছে, একদিন হয়তো সেখানে হবে বিশাল সমুদ্র; আজ যেখানে আছে গভীর সমুদ্র সেখানে হয়তো বা সৃষ্টি হবে হিমালয়ের মতন বিশাল পর্বত।

আর তোমরা শুনে অবাক হবে, দুনিয়ার সব চাইতে বড় পর্বত যে হিমালয়, সেটা একদিন সত্যি সত্যি সমুদ্রের নিচে ডুবে ছিল। ভূ-বিজ্ঞানীদের (অর্থাৎ যেসব বিজ্ঞানী দুনিয়ার গড়ন নিয়ে নাড়া-চাড়া করেন) মতে, দুনিয়াতে বড় বড় যত পাহাড় আছে তার মধ্যে হিমালয়ের বয়সই নাকি সব চাইতে কম; এত কম যে 'বুড়ো খোকা' হিমালয়ের নাকি এখনও গড়ে ওঠাই শেষ হয় নি। একটু যুতসই মতো নড়েচড়ে বসতে গিয়েই আসামের ভূমিকম্পটা হয়ে গেল!

হিমালয়ের জন্ম সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বলেন, একবার একটা বিরাট ভূমিকম্প হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের তলাটা মিন্দানাও দ্বীপের কাছে অনেকখানি বসে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উলটো দিকে গজিয়ে ওঠে বিরাট হিমালয় পর্বত। এটাও সেই ভূমিকম্পেরই কীর্তি।

তোমরা হয়তো বলবে, হিমালয় যে একদিন সত্যিই সমুদ্রের নিচে ছিল, তা কী করে বোঝা গেল?—হ্যাঁ, তারও প্রমাণ আছে বৈকি। বিজ্ঞানীরা হিমালয় পাহাড়ের চূড়োয় বরফের ভেতর থেকে এমন সব ফসিল হয়ে যাওয়া শামুক, ঝিনুক আর মাছের হাড় খুঁজে বের করেছেন যেগুলো বহু লক্ষ বছর আগে গভীর সমুদ্রের তলাতেই কেবল পাওয়া যেত। এ থেকেই বোঝা যায় পৃথিবীর ওপর একটা ওলট-পালট হয়ে সমুদ্রের নিচে থেকে পাহাড়টা ওপরের দিকে মাথা তুলে দিয়েছিল, আর তখনই ওই সব শামুক আর মাছের কাঁটাগুলোও ওপরে ওঠে যায়।

তোমরা শুনে আরো আশ্চর্য হবে, আজ যেখানটায় চাটগাঁ শহর সে জায়গাও যে এককালে সমুদ্রের তলায় ডুবে ছিল বিজ্ঞানীরা চাটগাঁয় পাহাড়ের মাটির স্তর পরীক্ষা করে নাকি তারও প্রমাণ পেয়েছেন।

ঐতিহাসিক যুগেই একবার মানুষের চোখের সামনে একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়। ১৭৫৫ সালে এক ভূমিকম্পে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরের একটা অংশ ষাট হাজার লোক নিয়ে মাত্র ছ'মিনিটের মধ্যে একদম সমুদ্রের ভেতর তলিয়ে যায়।

করাচির কিছুটা নিচে ভারতের ম্যাপে দেখবে একটা ঠোঁটের মতন জায়গা বেরিয়ে আছে—এটাকে বলে কাথিওয়াড় উপদ্বীপ। এর উত্তরে যে কচ্ছ উপসাগর, এটা মাত্র দুশো বছর আগেও ছিল একটা শুকনো জায়গা। জায়গাটা ১৮১৯ সালে সমুদ্রের ভেতর ডুবে গিয়েছে।

আজকাল বিজ্ঞানীদের মত হচ্ছে, সব সময়েই দুনিয়ার ওপরে কোন না কোন জায়গায় ছোটখাট ভূমিকম্প হচ্ছেই। প্রতি বছর দুনিয়াতে ছোটবড় কয়েক লক্ষ ভূমিকম্প হতে পারে। তবে ১৯৫০ সালে আসামের ভূমিকম্প বা ১৯৬৮ সালে ইরানের খোরাসান এলাকায় যে ভূমিকম্পে এক সঙ্গে প্রায় ২৫,০০০ লোকের প্রাণ হারায়। এত বড় ভূমিকম্প খুব কমই হয়ে থাকে।

ভূমিকম্পের নানান কারণ থাকতে পারে; যেমন জোঁয়ার-ভাটার টান, জল-প্রপাত, আগ্নেয়গিরি এই সব। তাছাড়া, পৃথিবীটা সব সময় তার মেরুদণ্ড ত্যারচা রেখে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, তার জন্যেও নাকি এর ভেতরে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

তবে মোটামুটিভাবে বিজ্ঞানীদের মতে ভূমিকম্পের আসল কারণ হচ্ছে মাটির নিচে কোন স্তর ফেটে যাওয়া—যাতে করে আশেপাশের স্তরগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে সেখানে পড়তে থাকে। তাহলেই তোমরা এবার প্রশ্ন করে বসবে, কিন্তু এই স্তরগুলো ফাটে কেন?

প্রশ্নটা মোটেই সহজ নয়—তবু একবার বোঝার চেষ্টা করা যাক।

পৃথিবীর ওপরটা দিব্যি ঠাণ্ডা দেখলে কি হয়, ভেতরে এর এখনও দস্তুরমতো গরম। যারা মাটির নিচে খনির ভেতরে নেমে কাজ করে তারাই এটা জানে। ভেতরটা এত গরম যে, মাটির শ'খানেক কিলোমিটার নিচেই ধাতুগুলো প্রায় গলা অবস্থায় রয়েছে—পৃথিবীর ওপরকার অংশটা তারই ওপরে ভাসছে।

পৃথিবীর ভেতরকার এই তাপ সব সময়েই নানানভাবে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে—আর তার ফলে পৃথিবীটা ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হচ্ছে আর সংকুচিত হয়ে আসছে। তাছাড়া পৃথিবীর ওপরকার লক্ষ লক্ষ টন ওজনের পাহাড় পর্বত আর মাটির

স্তরের চাপ পড়ছে ভেতরের ওই প্রায় তরল অংশের ওপরে। এর দরুনও ভেতরকার স্তরের খানিকটা সংকোচন হয়। অবশ্যি এই সংকোচন খুবই সামান্য—একশো বছরে হয়তো কয়েক সেন্টিমিটার মাত্র।

কিন্তু এসবের জন্যে পৃথিবীর বাইরের দিককার স্তরগুলোর ওপর একটা দারুণ রকমের চাপ পড়ছে—অনেক সময় চাপের চোটে এগুলো বাঁকা হয়ে ভাঁজ হয়ে যায়।

ধর, একটা রবারের বলের ওপর তুমি আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিচ্ছ, এতে বলটা খানিকটা টোল খেয়ে সংকুচিত হয়ে যাবে। তারপর হাতটা ছেড়ে দাও, সঙ্গে সঙ্গে নিচু জায়গাটা আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। এই যে আগের অবস্থায় ফিরে আসার চেষ্টা, এর নাম হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা গুণ।

পৃথিবীরও এই রকম স্থিতিস্থাপকতা আছে। তাই চাপ পড়ে কুঁচকে যাওয়া স্তরগুলো সব সময়েই আবার তার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চাইছে। চাপ বাড়তে বাড়তে যদি এমন অবস্থায় পৌঁছয় যে স্তরগুলো আর কিছুতেই তা সইতে পারছে না, তাহলে স্তরটা হঠাৎ ফেটে যায়। কিংবা হঠাৎ যদি কোন প্রাকৃতিক কারণে চাপ বেশি রকম কমে যায় তাহলেও স্তর ফাটতে পারে।—আর অমনি শুরু হয় একটা বিরাট আলোড়ন।

আরো এক ধরনের ভূমিকম্প হয়। ধরো, হিমালয় পর্বত থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার টন ওজনের কাদা-বালি-পাথর ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, সিন্ধু এই সব নদীর মোহনায় এসে পড়ছে। এগুলো জমে জমে এই সব অঞ্চলের মাটির ওপর বিপুল এক চাপ দিচ্ছে। এই চাপ সইতে না পেরে অনেক সময় দুর্বল জায়গায় স্তর-বিপর্যয় হয়, আর অমনি তা ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে।

অবশ্য এটা ঠিক যে, সাধারণত আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি জায়গাতেই ভূমিকম্প বেশি হয়। তাই লোকে মনে করে আগ্নেয়গিরির জন্যেই ভূমিকম্প হচ্ছে। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তার উলটো। কোন জায়গার পাথুরে স্তর ভাঁজ হয়ে ফেটে গেলেই মাটির নিচ থেকে ভেতরের সব গলা ধাতু, লাভা আর নানান রকম বাষ্পীয় পদার্থ ছিটকে বেরুতে থাকে প্রবল বেগে। সেই জন্যে প্রায়ই ভাঁজপর্বতের কাছাকাছি আগ্নেয়গিরি থাকে, আর সেখানে ভূমিকম্প বেশি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের ধার দিয়ে এমনি বহু ভাঁজপর্বত আছে।

জন মিল্‌নে নামে একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী প্রথম ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন। দুনিয়ার ইতিহাসে যত বড় বড় ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে পুরনো

বই ঘেঁটে ঘেঁটে তিনি তার তালিকা করেন। তা থেকে নাকি দেখা যায় দুনিয়াতে ভূমিকম্পের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

খুব দূরে ভূমিকম্প হলেও তার ঢেউ-এর কাঁপনি ধরবার জন্যে মিলনে সাহেব এক রকম যন্ত্র তৈরি করেছেন—তার নাম হচ্ছে 'সাইস্‌মোগ্রাফ' (Seismograph)। আজকাল সব দেশের মানমন্দিরেই এই যন্ত্র রাখা হয়। অবশ্য, এখন এর আরো অনেক উন্নতি হয়েছে।

কোন জায়গায় ভূমিকম্প হলেই তা ঢেউ-এর আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে—ঠিক পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন ঢেউ ওঠে, তেমনি। ভূমিকম্পের নানান ধরনের ঢেউ হয়—লম্বালম্বি ঢেউগুলো সেকেণ্ডে প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলে। আড়াআড়ি ঢেউগুলোর বেগ এর চাইতে কিছু কম। যন্ত্রে এই সব ঢেউয়ের কাঁপুনি থেকেই কত দূরে আর মাটির কতখানি নিচে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে বিজ্ঞানীরা তা বুঝতে পারেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের ওপর যে সব কারণে টানাপোড়েন পড়ে আর স্তরটা ধ্বসে যায় তার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু আবহাওয়ার ব্যাপারে যেমন আমরা কখন ঝড়-বৃষ্টি হবে তা অনেক আগেই হাওয়া অফিস থেকে বলে দিতে পারি, ভূমিকম্পের ব্যাপারে তেমনিভাবে কোন সময়ে কোন স্তরটা ধ্বসে পড়বে তা আগে থেকে বলা যায় না। সাধারণত দেখা যায়, পূর্ণিমা বা অমাবস্যার কাছাকাছি ভূমিকম্প বেশি হয়। যে টানে জোয়ারের পানি ফুলে ওঠে হয়তো ঠিক একই টানে দুর্বল স্তরটা চাপ সইতে না পেরে ফেটে যায়।

তবে, বিজ্ঞানীরা কিছুতেই প্রকৃতির কাছে হার মানতে রাজি নন। হয়তো একদিন এমন যন্ত্র তাঁরা আবিষ্কার করে ফেলবেন যাতে কোথায় কোন সময়ে মাটির স্তর দুর্বল হয়ে পড়েছে আর শীগ্‌গিরই ভূমিকম্প হবে তা আগেভাগেই টের পাওয়া যাবে। আর সে সব জায়গার লোকে সাবধান হয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে পারবে।

ভূমিকম্পকে আগে থেকে ঠেকানো না গেলেও, ভূমিকম্পে ক্ষতি যাতে কম হয় তার জন্যে কংক্রিটের বাড়িগুলো বেশ টেকসই বলে মনে হয়। তাই আজকাল সাবেক ইটের বাড়ি ক্রমেই অচল হয়ে পড়ছে। জাপানে হরহামেশা ছোটখাট ভূমিকম্প লেগেই আছে; সেখানে ভূমিকম্প থেকে বাঁচার জন্যে ছোট ছোট কাঠের বাড়ি তৈরির রেওয়াজ উঠে গিয়ে তার জায়গায় তৈরি হচ্ছে বিরাট বিরাট কংক্রিটের বাড়ি।

এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে

দুর্যোগময় শীতের রাতের কুয়াশাঢাকা নোংরা অন্ধকারকে ভেদ করে পুবের আকাশে দেখা দেয় সুবেহ সাদেকের প্রথম আলোর আভাস । কতো প্রাণান্ত তপস্যার পর কী আশ্চর্য আশা-ভরসা-আশ্বাস নিয়ে আসে সেই আলো!

সেই প্রথম আলোর শিশুই তো বয়ে আনে নতুন সূর্যের প্রাণ-মাতানো আলোর বন্যার খবর। নতুন আলোর সাথে সাথে আসে নতুন কথা, নতুন গান, নতুন জীবন। বুঝি তাই কিশোর কবির কাছে "সকালের এক টুকরো রোদ্দুর এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামী।"

প্রথম দু-একটি আলোর কণা হয়তো হারিয়ে যায় কোন গহীন অরণ্যের অন্ধকারে—হয়তো ছিটকে পড়ে কোন পাহাড়ের খাদে। রাতের অন্ধকার হটতে চায় না সহজে। কিন্তু তারপর আলোর রাশি আসতে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে, হাজারে হাজারে। বিভীষিকাময় অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে, নিঃশেষে মুছে দিয়ে ঝলমল করে হাসতে থাকে নতুন দিনের দিগন্তজোড়া সোনার সকাল।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমি তখন ইস্কুলের ছাত্র। এক কৃষক ভাইকে নিয়ে পড়েছিলাম ভারি বিপদে। কথায় কথায় তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম যে,

আমাদের পৃথিবীটা গোল, পৃথিবীটা ঘুরছে, আর এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছে সূর্য থেকে। কিন্তু কথাগুলো কিছুতেই বুঝতে পারছিল না সে।

আমাদের গ্রামের কছির শেখ নেহাত একজন দিনমজুর। মাঝারি বয়স —কামলা খেটে তার দিন চলে। সকাল বেলা বেরিয়েছে শহরের পথে, দুধ বেচতে। বেড়াতে বেড়াতে আমিও তার সঙ্গ নিয়েছিলাম।

আমার বয়স তখন খুব কম। কিন্তু তা হলেও আমি ইস্কুলে পড়ি—কতো কী বই-কেতাব ঘেঁটেছি। আর কছির শেখ জীবনে কখনোও ছাপার হরফে চোখ বোলায় নি, পেনসিল দিয়ে কাগজের পাতায় দাগ কাটে নি কোনদিন। তাই আমার কাছে সে অনেক কিছু জানতে চায়, জিজ্ঞেস করে নানান অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন। অথচ বিজ্ঞানের নিতান্ত সহজ কথাগুলোও কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না তাকে।

পৃথিবী যে গোল তার যতগুলো প্রমাণ ইস্কুলের বইতে পড়া ছিল, খুব সোজা করে সব একে একে বললাম তাকে। বয়স আর দুঃখের ভারে জরাজীর্ণ ভাবলেশশূন্য মুখে সে শুধু চুপ করে শুনে গেল।

বললাম ঃ ওই যে সূর্যটা, দেখতে গনগনে আগুনের গোলার মতো, ওটা হচ্ছে একটা 'ছোটখাট তারা', আর ওটা আছে আমাদের পৃথিবী থেকে ন'কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে। সোনার থালার মতো গোল ওই বিরাট সূর্যটা আবার ছোটখাট তারা কি রকম? অনেকক্ষণ ধরে তাকে বোঝাতে হল ন' কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল ব্যাপারটা কত বড়। বললাম ঃ আজ যদি পৃথিবী থেকে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ট্রেন ছাড়া যায়, তবে দিন, রাত চব্বিশ ঘণ্টা একটানা নাক বরাবর চলেও তার সূর্যে গিয়ে পৌঁছতে দু'শো বছর পেরিয়ে যাবে।

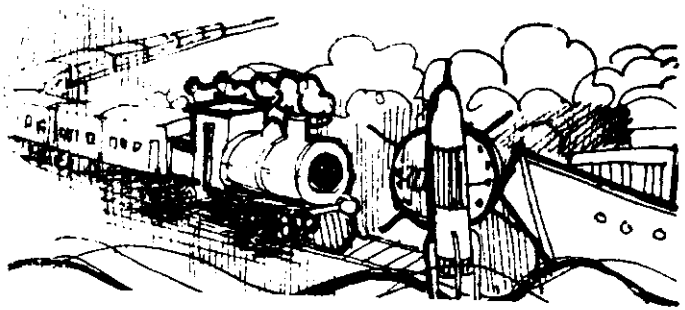

তারপর বললাম কি করে ওই সূর্যের গনগনে আগুনের গোলা থেকেই হল আমাদের পৃথিবীর জন্ম—ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে পৃথিবী কি করে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছল।

কছির শেখ যখন শুনল সূর্য আমাদের পৃথিবীর চারধারে ঘুরছে না, পৃথিবীই ঘুরছে সূর্যের চারধারে, তখন সে দস্তুরমতো অবাক হয়ে গেল। গাছপালা, মানুষ, গরুবাছুর, জমিজমা সব কিছু নিয়ে এই পৃথিবীটা যে কমলা লেবুর মতো গোল (খালি গোল না, ওপর-নিচে নাকি আবার খানিক চ্যাপটাও), আর এই বিরাট পৃথিবীটা যে শূন্যের মধ্য দিয়ে শোঁ শোঁ করে ছুটে বেড়াচ্ছে, একথা তার কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। পৃথিবী যদি গোল হবে তবে আমরা পড়ে যাই নে কেন? পৃথিবী যদি শূন্যের ওপর দিয়ে ঘুরছে, ছুটছে তাহলে আমরা তা একেবারেই বুঝতে পারি নে কেন?

কথায় কথায় মাঠের আলের পথ পেরিয়ে আমরা বাঁধানো সড়কে এসে পড়েছি। সড়কের মাঝখানে রেলওয়ের লেভেল ক্রসিং, আড়াআড়িভাবে সড়ক ডিঙ্গিয়ে রেল লাইন পাতা, সেখান দিয়ে আমাদের সামনেই হুস হুস করে একটা ট্রেন চলে গেল।

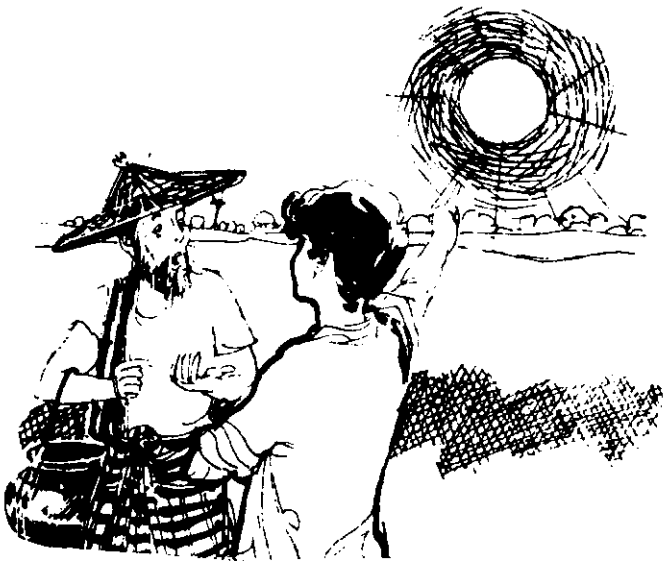

শেষকালে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এই রেলগাড়ি দিয়েই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করি। রেলগাড়িতে বসে জানালা দিয়ে দূরে তাকালে মনে হবে, বুঝি আমরা চুপচাপ আছি, বাইরের গাছপালা বাড়িঘড়গুলোই আমাদের ফেলে দৌড়ুচ্ছে পেছনের দিকে। পৃথিবীর বেলাতেও তেমনি। পৃথিবী পশ্চিম দিক থেকে পুব দিকে ঘুরছে, অথচ আমরা দেখি ঠিক তার উলটো, যেন সূর্যই পৃথিবীর চারধারে ঘুরছে পুব থেকে পশ্চিমে।

কিন্তু এত সব কথা আমি শোনাচ্ছি কাকে? কছির শেখ তো জীবনে কোনদিন রেলগাড়িতেই চড়ে নি।

সে জিজ্ঞেস করে, রেলগাড়ির মতো বিরাট দৈত্যটা কি করে চলে?—আগুনে পানি গরম করলে যে বাষ্প তৈরি হয় তার বিপুল শক্তির কথা বলি তাকে। এই শক্তিতে রেল চলে, জাহাজ চলে, কত বড় বড় কলকারখানা চলে। শুনে কছির শেখ ভারি তাজ্জব হয়। কিন্তু কী আসে যায় এই বাষ্পের শক্তিতে তার? কামলা খেটে দিন আনে দিন খায় যে কছির শেখ, বাষ্পের শক্তিতে তার কোন্ লাভটা?

এমন সোজা ব্যাপারগুলো তাকে বোঝাতে না পারায়, সত্যি বলতে কি, দুঃখে আমার কান্না পায়। এতক্ষণে কী ভাবল সে? এই ইংরেজি পড়া ছেলেগুলো যেন আরেক দুনিয়ার মানুষ। সেখানে পৃথিবীটা কমলা লেবুর মতো গোল, পৃথিবী সূর্যের চারধারে ঘোরে, সূর্য একটা ছোটখাট তারা, সেখানে বাষ্পের শক্তিতে হরেক রকম কল চলে ঃ একদম আরেক দুনিয়া সেটা। তার জীবনের সাথে এই দুনিয়ার কোনরকম যোগই নেই।

কিন্তু সত্যি কি তাই? সত্যি কি কছির শেখ আরেক দুনিয়ার মানুষ?

আমার ছোটবেলার দেখা সেই কছির শেখ আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু আজো এমনি হাজার হাজার লাখ লাখ কছির শেখ ছড়িয়ে আছে আমাদের দেশের গ্রামে-গঞ্জে, আমাদের আশেপাশে চারধারে। তাদের চোখে শিক্ষা আর সভ্যতার আলো এখনও গিয়ে পৌঁছে নি, বিজ্ঞানের দান তাদের জীবনে আনে নি কোন আশীর্বাদ। তাদের চোখে এখনও অন্ধকার—এই অন্ধকার আমাদের চারপাশের এই দুনিয়ারই অন্ধকার।

কিন্তু এই অন্ধকার কি আমাদের দুনিয়াতে চিরদিনই থাকবে?—ইচ্ছে করলে এই অন্ধকারকে কি হটানো যায় না?

এসো অতীতের সমস্ত অন্ধকার আর গ্লানির জগৎকে পেছনে ফেলে আমরা আলোর রাজ্যে বিজ্ঞানের রাজ্যে পা দিই।

বিজ্ঞানের রাজ্যে, এই পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়, সেখানে যেতে হলে চোখে স্বপ্নের ঠুলিও পরতে হয় না। আমাদের আশেপাশে চারধারে ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির কতো বিস্ময়, বিজ্ঞানের কতো বৈচিত্র্য। চোখ খোলা রাখলেই সে-সব দেখতে পাওয়া যায়। রাতের আকাশ তারায় তারায় ছেয়ে যায়। দিনে সূর্যের আলোয় পৃথিবীর বুক ঝলমল করে। বর্ষার দিনে আকাশ ছেয়ে মেঘ করে, অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে; বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে মাঠে কচি কচি ধানের শীষগুলো হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে হেসে ওঠে। রামধনুকের সাতটি রঙ পেখম ছড়ায় আকাশ জুড়ে। এ সব কিছুর মধ্যেই; হ্যাঁ, সব কিছুর মধ্যেই ছড়িয়ে আছে বিজ্ঞানের আশ্চর্য জাদু।

কছির শেখের চোখে এই জাদু সব ধরা পড়ে না—এর অনেক রহস্যই তার অজানা। তাই তার মন কুয়াশায় ঢাকা, তাই তার মনে অন্ধকারের বাসা।

এই সব রহস্যকে জানা, প্রকৃতির নিয়ম-কানুন জেনে তাকে বাগ মানানো, প্রকৃতিকে মানুষের বশ করা—এই হল বিজ্ঞানের কাজ। বশ করা জীবনেরই জন্যে—অন্ধকার, দুঃখ আর বিভীষিকার পুরনো জীবনকে হটিয়ে দিয়ে নতুন জীবনের জন্যে, সুখ, সৌন্দর্য আর প্রাচুর্যের জন্যে।

তাই বিজ্ঞান হল একটা হাতিয়ার—জীবনকে, দুনিয়াকে বদলাবার হাতিয়ার।

তাই এসো আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মশাল জ্বালি। কেননা যেখানেই আমরা এই মশাল জ্বালি না কেন, আর আজ তা যত ছোটই হোক, আমরা তো জানি, এই মশাল একদিন জ্বলে উঠবে দেশের দিকে দিকে; তার উজ্জ্বল আলো গিয়ে ছড়িয়ে পড়বে কছির শেখের মতো আমাদের দেশের হাজার হাজার, লাখ লাখ ভাইবোনের চোখে—আর তাদের চোখের অন্ধকার, মনের অন্ধকার যাবে কেটে।

তখন তারা দেখবে, জীবনকে সুখী আর সুন্দর করার কী অফুরন্ত আয়োজনই না রয়েছে এই দুনিয়াতে। বিজ্ঞানের রাজ্যে শুধু বাষ্পের শক্তিই নয়, আছে সূর্যের অপরিমেয় আলো, মাটির সীমাহীন উর্বরতা, আছে হাওয়া আর পানির শক্তি, বিদ্যুৎ আর পরমাণুর শক্তি। আর এ সমস্তই আছে মানুষের সেবার জন্যে। এতদিন কতো অফুরন্ত শক্তিই না ছিল তার নাগালের বাইরে!

সেদিন আমাদের দেশের হাজার হাজার মানুষ যদি বলতে শুরু করে ঃ দুঃখ-গ্লানির অন্ধকারে আমরা আর বন্দী থাকব না, বিজ্ঞানের হাতিয়ার নিয়ে সুখ-শান্তি-আনন্দের নতুন জীবন আমরা কায়েম করব; আর সেই হাজার হাজার মানুষ যদি পরিশ্রম করতে শুরু করে তার জন্যে, তখন? তখনও কি আমাদের জীবনের চারপাশ থেকে এই অন্ধকার না হটে পারবে?

তাই এসো, নতুন জীবনের জন্যে আমরা এক হই। এসো, আমরা বিজ্ঞানের রাজ্যে পা দিই!

ISBN 984- 8323- 06- 6
9 789848 323069

সেকায়েপ

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP)-এর পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।

বিক্রির জন্য নয়